সাপ্তাহিক

ফেলুদার ধাঁধা, ধাঁধায় ফেলুদা

বিশেষ সংখ্যা

আনন্দমেলা

৩মে ২০০০ দশ টাকা

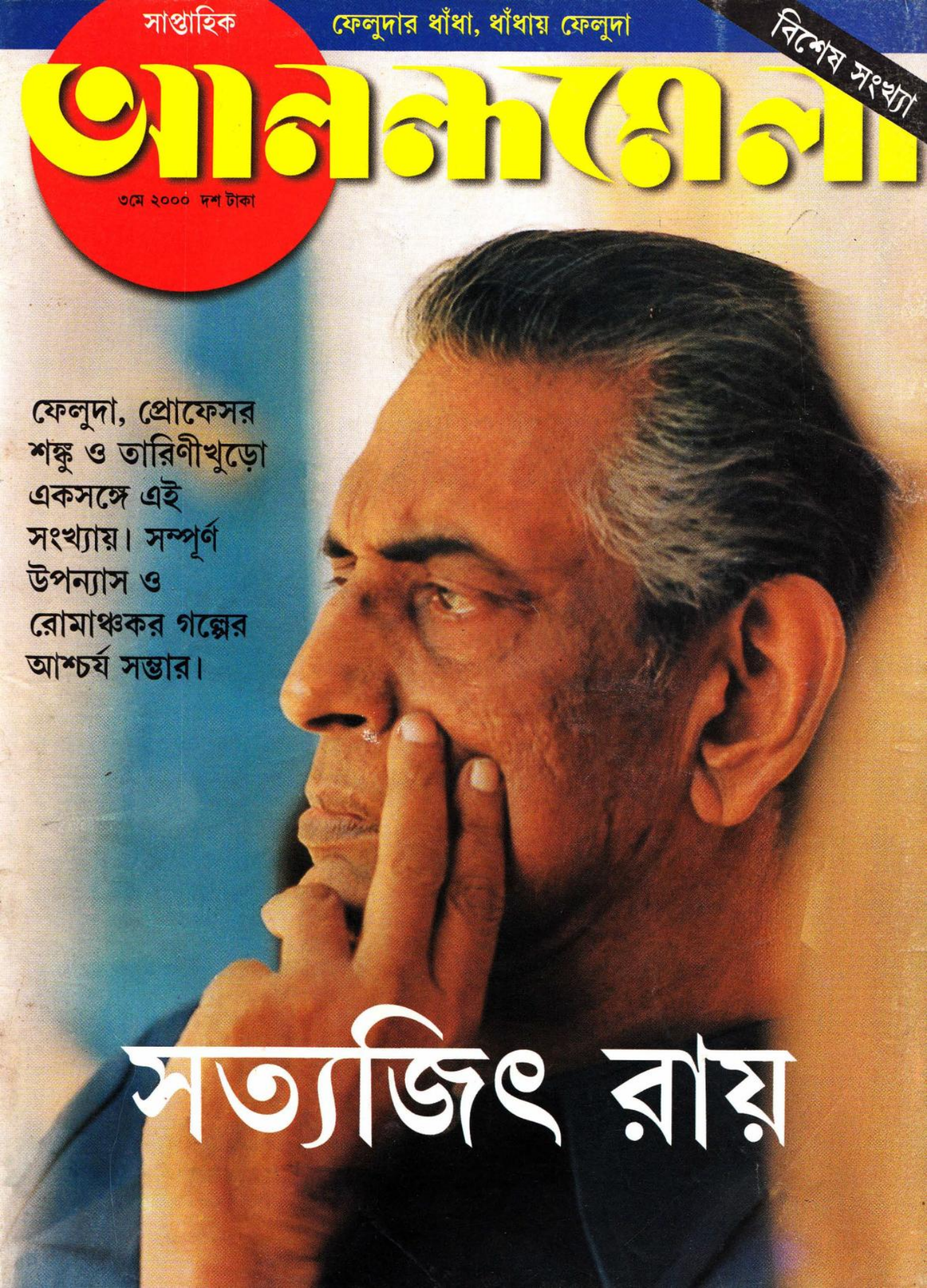

ফেলুদা, প্রোফেসর শঙ্কু ও তারিণীখুড়ো একসঙ্গে এই সংখ্যায়। সম্পূর্ণ উপন্যাস ও রোমাঞ্চকর গল্পের আশ্চর্য সম্ভার।

সত্যজিৎ রায়

২৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২০ বৈশাখ ১৪০৭ ৩ মে ২০০০

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

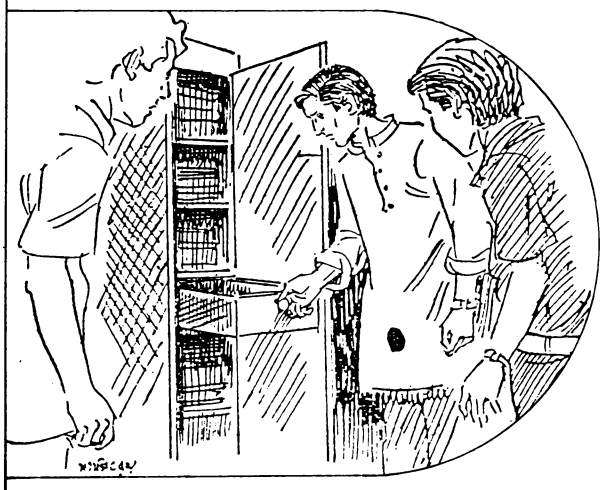

সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা

সম্পূর্ণ ফেলুদা - উপন্যাস

গোলোকধাম রহস্য

৭ চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন? 'কে'-র অর্থ কী? অসমাপ্ত কাজটা কী? পর পর এই তিনটি প্রশ্ন খাতায় লিখেছেন ফেলুদা। রহস্য- সমাধানে এসব প্রশ্নের উত্তর খুব জরুরি। এবং সমাধানের কাজটি রীতিমত জটিল 'গোলোকধাম রহস্য' উপন্যাসে। গোয়েন্দা ফেলুদাকে নিয়ে এই সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত হল 'আনন্দমেলা'-র বর্তমান সংখ্যায়।

নিবন্ধ প্রতিযোগিতা

মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও কি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তাভাবনায় উৎসাহ দিতে আয়োজন করা হচ্ছে এক নিবন্ধ প্রতিযোগিতা। ৫০০ শব্দের মধ্যে ওপরের বিষয়ে নিবন্ধ লিখে আনন্দমেলা পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে পাঠালে নির্বাচিত তিনটি নিবন্ধকে পুরস্কৃত করা হবে। দেওয়া হবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার। কুপনের মূল কপি নিবন্ধের সঙ্গে পাঠাতে হবে। 'আনন্দমেলা নিবন্ধ প্রতিযোগিতা'— কথাটি অবশ্যই খামের ওপরে লিখতে হবে। এই প্রতিযোগিতার বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনও যোগাযোগ করা যাবে না। সেরা নিবন্ধ নির্বাচনে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। নিবন্ধটি ১৮ মে ২০০০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই আমাদের সম্পাদকীয় দফতরে পৌঁছনো দরকার।

প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প

স্বপ্নদ্বীপ

২৩ ইউরোপের সাতজন স্বনামধন্য মনীষী একজোটে উধাও হয়েছেন। সাতজনেই একদিনে একই সময়ে অদৃশ্য হয়েছেন। ওঁরা সকলেই ম্যানিলা শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। প্রোফেসর শঙ্কুরও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত কী হল? শঙ্কু কোথায় গেলেন? কী অভিজ্ঞতা হল তাঁর? জানতে হলে পড়তে হবে সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ গল্প 'স্বপ্নদ্বীপ'।

তারিণীখুড়োর গল্প

লখ্‌নৌর ডুয়েল

৩৫ সত্যজিৎ রায়ের লেখা তারিণীখুড়োর গল্পগুলিও সমান জনপ্রিয়। সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা প্রকাশ করলাম ফেলুদা ও শঙ্কু কাহিনীর সঙ্গে তারিণীখুড়োর একটি গল্পও। নাম 'লখ্‌নৌর ডুয়েল'।

অন্যান্য

বিভাগ

ফেলুদার ধাঁধা, ধাঁধায় ফেলুদা
সুখেন বিশ্বাস ৪
মাধ্যমিকের লেখাপড়া
বাংলা ● অলক দত্ত ৪২
ইংরেজি ● রণধীর ভট্টাচার্য ৪৫
অঙ্ক ● প্রশান্তকুমার বসু ৪৭
ধাঁধালি ● অমল ভৌমিক ৫০
খাদিম-এর হজবরল ৫৫
ড্রাকুলার সন্ধানে অর্জুন
● সমরেশ মজুমদার ৫৬
সবুজ পাতা ● জয়ন্ত বসু ৫৯
কুইজ ৬০
গতির লড়াইয়ে জিতবেন কোন
বোলার ● তানাজি সেনগুপ্ত ৬২
ফুলব্যাক ● মানস চক্রবর্তী ৬৪
খেলার খবর ● দর্শক ৬৬
নিয়মিত কমিক্স : ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৮

প্রচ্ছদের ফোটো :
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা।

ফেলুদার ধাঁধা, ধাঁধায় ফেলুদা

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-কাহিনীতে আছে অনেক ধাঁধা। সেইসব ধাঁধার জট খুললেই পাওয়া যাবে রহস্যের সমাধান-সূত্র। জানিয়েছেন সুখেন বিশ্বাস

ফেলুদা। সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র। লালমোহনবাবুর ভাষায় মিস্টার মিত্তির। এবং তাঁরই দেওয়া আখ্যায় ভূষিত এ.বি.সি.ডি., অর্থাৎ 'এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর'। আর তোপসের ভাষায়, ফেলুদা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তদন্তকারী।

কনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌স, আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ এবং তাঁর উত্তরসুরি হিসেবে ফেলুদা সার্থক। হোম্‌সের সহযোগী হিসেবে কনান ডয়েল নিয়েছেন ওয়াটসনকে। শরদিন্দু অজিতকে। কনান ডয়েল বা শরদিন্দুর মতো সত্যজিৎও গোয়েন্দা কাহিনীতে ফেলু মিত্তিরের সহযোগী হিসেবে তোপসেকে নিয়েছেন। তারপরে এসেছেন জটায়ু। রহস্য উন্মোচনে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। এভাবে ত্রিশূল 'ফর্মুলা'য় রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে অসাধারণ।

ফেলু মিত্তিরের জন্ম ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ কলকাতার তারা রোডে। পিতা ছিলেন জয়কৃষ্ণ মিত্র। ফেলুদা জীবনের প্রথমদিকে একটা চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা কিছুদিনের জন্য। তারপর তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দেন। তাঁর ভাণ্ডারে টাকা পয়সাও বিশেষ জমেনি। কারণ জীবনের অনেকটা সময়ই তিনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন। সেটাই হল রহস্য উন্মোচন। ওঁর যখন ২৭ বছর বয়স, সেই ১৯৬৫ সাল থেকেই শুরু অপরাধ উদ্‌ঘাটনের।

'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে ফেলুদা ও তোপসে। এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

'সোনার কেল্লা' ছবিতে ফেলুদাবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

স্মার্ট, মেদহীন, সুদর্শন, কারুবাক, বুদ্ধিদীপ্ত ছ'ফুট উচ্চতার এই যুবক সাধারণ বাঙালি হয়েও অন্যরকম।

গোয়েন্দাগিরিকে নিজের পেশা হিসেবে নেওয়ার পরই ফেলুদা হয়েছেন 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' প্রদোষ সি. মিটার। আরাম কেদারায় বসে ধূমপান করতে- করতে, কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে বা সিগারেটের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী ছাড়তে-ছাড়তে তিনি রহস্যের সমাধান করেননি। রহস্য উন্মোচনে সোজা চলে গেছেন লন্ডন, গ্যাংটক, কাঠমান্ডু বা রাজস্থানে। ফেলুদার কাছে রহস্যের উন্মোচন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তা অনাস্বাদিত অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে ভরা। রহস্য উন্মোচনে ফেলুদা মাঝে-মাঝেই ছদ্মবেশ নিয়েছেন। মাঝে-মধ্যে রিভলভারও চালিয়েছেন। তবে এটা ঠিক, ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারে শব্দজব্দ, ধাঁধা, ছড়া-সংকেত পাঠকদের মনে এক অনাস্বাদিত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। ধাঁধার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অনেক গল্পে মূল রহস্যেরই সমাধান হয়েছে।

যেমন, ধরা যেতে পারে, 'সমাদ্দারের চাবি' গল্পটি। এই গল্পের রাধারমণ সমাদ্দার সুররসিক ব্যক্তি। ব্যাঙ্কের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। তিনি টাকা রেখেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব উপায়ে। এই কাজে তাঁকে সহায়তা করেছে জার্মানির এক কোম্পানি। মৃত্যুর আগে রাধারমণবাবু সাংকেতিক উপায়ে তাঁর সঞ্চিত অর্থের সূত্র জানিয়ে যান সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে। প্রথমে বলেন, 'আমার ... নামে ...'। তারপরে অনেক কষ্টে দু'বার বললেন — 'চাবি ... চাবি ...'।

এবারে ফেলুদার পালা। তিনি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে এসে চিন্তিত হয়ে পড়েন। টাকার বাক্সের চাবি 'রাধারমণবাবুর নামে' এই কথা ভেবে! কিন্তু এটাও ঠিক, ফেলুদাকে সাংকেতিক সূত্র থেকেই অর্থ উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করতে হবে। বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন ও ধাঁধার ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখেই তিনি নেমে পড়েন সাংকেতিক শব্দের অর্থ উদ্ধারে। রাধারমণবাবুর শেষ কথা, 'আমার নামে চাবি'। অর্থাৎ রাধারমণ সমাদ্দারের নামে চাবি। পাঠকদের মতো ফেলুদাও ধাঁধার রহস্য উদ্ধারে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁর তীক্ষ্ণ, শাণিত বুদ্ধিমত্তা ধাঁধার রহস্য উন্মোচন করে ফেলে। আর এই রহস্য উন্মোচনে তাঁকে রিভলভার চালাতে হয়নি। ছদ্মবেশও নিতে হয়নি। ধাঁধার সমস্যা সমাধানেই হয়েছে রহস্যের সমাধান।

'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' গল্পেও 'ধাঁধা' আছে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে। রাতের অন্ধকারের পটভূমিকায় এই গল্প। সকালের নির্মল আলোয় সমাধান। অর্থাৎ, গল্পের মধ্যে ধাঁধাই রহস্যের অন্ধকার ছড়িয়েছে। ফেলুদা ধাঁধার অর্থ উদ্ধার করেই অন্ধকার রাতে সকালের নির্মল আলো এনেছেন। এটি খুনের গল্প। বাবাকে ছেলে খুন করেছে সিন্দুকের সাংকেতিক অর্থ জানতে। সব বিবেক ও মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে নীচ প্রবৃত্তির অন্ধ রূপ ফুটে উঠেছে এখানে। টিয়াপাখির কথা বলা ধাঁধার প্রধান আকর্ষণ। মৃত্যুর আগে কালীকিঙ্করবাবু বাড়ির টিয়াপাখিকে ধাঁধার ঢঙে একটা সংখ্যা শিখিয়েছিলেন। সেটি 'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো'। ফেলুদা হত্যারহস্য উন্মোচন করতে এসে ধাঁধার অর্থ উদ্ধারে মেতে ওঠেন। ফেলুদার সঙ্গে পাঠ করাও উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন সাংকেতিক অর্থের। ফেলুদা অবশেষে ধাঁধার অর্থ

'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' গল্পে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবি

উদ্ধার করেন। সঙ্গে-সঙ্গে উদ্‌ঘাটন হয় কালীকিঙ্কর বাবুর হত্যারহস্য।

'গোলোকধাম রহস্য' গল্পে আলাদাভাবে শব্দজব্দ বা শব্দ খেলার চিত্র নেই। তবে 'গোলোকধাম' ও 'গোলকধাঁধা' পরস্পর ধ্বনিসাম্যের কাছাকাছি। গোলকধাঁধার মতোই গোলোকধামে তিনটি রহস্যের সমাধান করেছেন ফেলুদা। সেগুলি— নীহারবাবুর 'অ্যাকসিডেন্ট' ঘটানো ; নীহারবাবুর ঘরে চুরির রহস্য ভেদ এবং সুপ্রকাশ দত্তর খুনিকে চিহ্নিত করা।

রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীতে ফেলুদা প্রথম থেকেই দক্ষ। ধাঁধা বা সাংকেতিক শব্দের রহস্য উন্মোচনে সিদ্ধহস্ত। তাই 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন 'কিউরিও' সম্বন্ধে একটা 'কিউরিয়সিটি' বোধ করছি। আবার 'বাদশাহী আংটি' গল্পে বনবিহারীবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা বিকট চিৎকার শুনে ফেলুদা একটা হাই তুলে বলতে পারেন 'হাইনা'। কিন্তু এই গল্পের ধাঁধা, ক্রিমিন্যাল বনবিহারীবাবুর হাতে। কারণ ইংরেজি-বাংলা অর্থ মিলিয়ে শব্দজব্দ তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। যেমন, Steal মানে হরণ, Horn মানে শিং, Sing মানে গান, Gun মানে কামান। পিয়ারীলালের মুখে বলা 'স্পাই' শব্দটা যে গুপ্তচর নয়, সেটা যে 'স্পাইডার' শব্দের প্রথমার্ধ, এটা ফেলুদার বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। আর এর মধ্যে দিয়ে পেয়ে গেছেন অপরাধীর হদিস ও ঠিকানা!

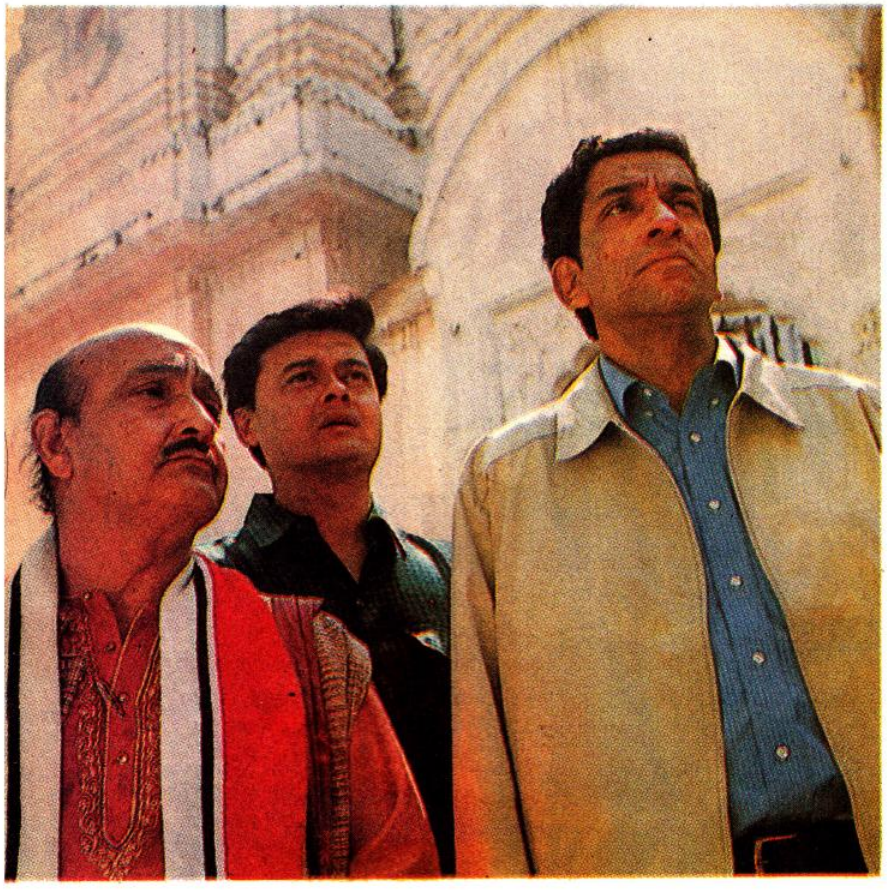

সন্দীপ রায় পরিচালিত টেলিসিরিয়াল 'গেলাপী মুক্তো রহস্য'-র একটি দৃশ্য। এখানে ফেলুদা চরিত্রে অভিনয় করছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী

ফোটো : হীরক সেন

'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' গল্পের শুরুই হয়েছে অদ্ভুত এক ছড়া দিয়ে। 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ/ হাত গোন ভাত পাঁচ/ দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।/ ফাল্গুন তাল জোড়/ দুই মাঝে ভুঁইফোড়/ সন্ধানে ধন্ধায় নবাবে।।' আগেই বলেছি, ফেলুদা ধাঁধার রহস্য উদঘাটনে সিদ্ধহস্ত। তিনি শাণিত বুদ্ধিবলে সরেজমিনে তদন্তে নেমে ছড়ার রহস্য উন্মোচন করেছেন। তারপরেই পেয়েছেন গুপ্তধনের সন্ধান। অর্থাৎ, অশ্বত্থগাছের ৫৫ হাত উত্তরে আছে অর্জুনগাছ। আর জোড়া তালগাছ। তার মাঝে জমি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে গুপ্তধন। যা দেখে নবাবরা অবধি ধন্দে পড়বে। আর গুপ্তধনের সন্ধানেই তড়িৎবাবুর মৃত্যুরহস্য উন্মোচিত হয়েছে। মহীতোষবাবুর মুখোশ খসে পড়েছে।

ধাঁধা ও শব্দজব্দ যে শেষ পর্যন্ত গল্পে একটা চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'। ফেলুদার বুদ্ধিমত্তায় 'কৈলাশ' নামে ধরা পড়েছে কোথায় লাস? অর্থাৎ 'হোয়্যার ইজ দ্য ডেডবডি।' কী পাইনি, কী খুঁজছি-এর 'কী' শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়েও ফেলুদা অসাধারণ। 'বাঁদর' শব্দের অর্থভেদেও ফেলুদা অনন্য। এরকম অজস্র ধাঁধা আছে এই গল্পে। যেমন 'LOKC' শব্দ পড়ে লালমোহনবাবুর মনে হয়েছে 'লক' লিখতে গিয়ে বানান ভুলে এই কাণ্ডটা হয়েছে। তিনি 'OKAHA' এই শব্দকে মনে করেছেন এটি একটি জাপানি নাম 'ওকাহা'। কিন্তু লালমোহনবাবু ফেলুদা বা তোপসের কাছে জেনেছেন এর উচ্চারণ বা অর্থ সম্পূর্ণরূপেই ভিন্নার্থক। তারপরেই জলের মতো সহজ করে উচ্চারিত হয়েছে ইংরেজি অক্ষরের বাংলা উচ্চারণ। যেমন— RHAHA; SO; DO; NADO, NHE ইত্যাদি। সবশেষে সেই অতি দীর্ঘ বাক্যের উচ্চারণ— AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO PC LO ROT OT DD QK OJT RO OG,

নামের ক্ষেত্রেও ধাঁধা বিশেষ কার্যকর। এই গল্পে একটা ছোট মেয়েকে দেখিয়ে মহেশবাবু ফেলুদাকে বলেছেন, এটা আমার নাতনি। ওর নাম জোড়া মৌমাছি। উত্তরে মেয়েটা মহেশবাবুকে বলেছে, "আর তুমি জোড়া কাটারি।" ফেলুদা এককথায় ধাঁধার সমাধান করে মহেশবাবুকে বলেছেন— আপনার নাতনি হল বিবি। আর আপনি তার দাদু। এই গল্পে রহস্য উন্মোচনের চেয়ে ধাঁধার সমাধানেই পাঠকের আগ্রহ বেশি মনে হয়েছে। ধাঁধার আবহাওয়ায় 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' বারবার নতুন। বারবার প্রাণবন্ত মনে হয়েছে।

এবারে যদি ফেলুদা অ্যান্ড কোং-এর সঙ্গে রাজস্থানে যাওয়া যায় তবে মজা জমবে আরও বেশি। 'সোনার কেল্লা'-য় সিধু জ্যাঠার সঙ্গে ফেলুদার কথোপকথন হাস্যোদ্দীপক। ফেলুদা বলেছেন, "আপনি ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার নাম শুনেছেন বোধ হয়। যিনি প্যারাসাইকলজি নিয়ে—।" উত্তরে সিধু জ্যাঠা একটু বেঁকিয়ে ইংরেজি শব্দের বাংলা করেছেন। প্যরাসাইকলজি তাঁর কথায় হয়েছে পাড়া-ছাই-চলো-যাই। এইরকম আরও অনেক নমুনা আছে। যেমন তাঁর কথায় Exhibition— ইস কি ভীষণ, Impossible— আম পচে বেল, Dictionary— দ্যাখন নাড়ী এবং Governor রূপান্তরিত গোবর নাড়ুতে।

ফেলুদার রহস্য কাহিনীতে সমস্ত গল্প জুড়েই আছে ধাঁধা, শব্দজব্দ আর সংকেতের মজা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটায়ুর ভুলভাল ইংরেজি। পাঠকেরা হাসির বন্যায় ভেসে গেছে। যেমন 'বাক্স রহস্য'-এর সেই বিখ্যাত ভুল ইংরেজি—'এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুসপ্রিপ্ট।' অথবা টেলিফোনে বলা ভুলে ভরা সেইসব বিখ্যাত ইংরেজি—'দি সার্কাস হুইচ এসকেপড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার।' এর মধ্যে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তার আতঙ্কিত উচ্চারণ 'হ্যাঁয়েস' (হ্যাঁ ইয়েস)।

জটায়ুর প্রাণবন্ত কথাবার্তা যে ধাঁধা বা শব্দজব্দের মতোই মজার, তা জানা গেল 'সোনার কেল্লা' থেকে। দুর্বৃত্তের কবল থেকে শিশু জাতিস্মর মুকুল উদ্ধার হয়েছে। নিশ্চিতরূপেই তা ত্রিশূল ফর্মুলায়। গল্পের শেষে জটায়ুই মন্দার বোসের কোমর থেকে রিভলভার নিয়ে ফেলুদার হাতে দিয়েছে। ফেলুদা প্রত্যুত্তরে "ফ্যাক্ট ইউ" জানিয়েই হয়ে গেছেন গম্ভীর। তারপরেই জানিয়েছেন," আরে—এ যে একেবারেই ফাঁকি—মেড ইন জাপান-ম্যাজিসিয়ানরা স্টেজে ব্যবহার করে এই রিভলভার।" কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সকলকে চমকে দিয়ে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়েছেন জটায়ু। তারপরে জটায়ুর বাংলা-ইংরেজি মেশানো বিখ্যাত সংলাপ তো যুগ-যুগ ধরে মনে রাখার মতো। ধাঁধার মতোই প্রাণবন্ত, ধাঁধার মতোই রসিকতাপূর্ণ—"ফর মাই কালেকশন অ্যান্ড অ্যাজ এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান।"

সম্পূর্ণ ফেলুদা-উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

গোলোকধাম রহস্য

'জয়দ্রথ কে ছিল?'
'দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী।'
'আর জরাসন্ধ?'
'মগধের রাজা।'
'ধৃষ্টদ্যুম্ন?'
'দ্রৌপদীর দাদা।'
'অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শাঁখের নাম কি?'
'অর্জুনের দেবদত্ত, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়।'
'কোন অস্ত্র ছুঁড়লে শত্রুরা মাথা গুলিয়ে সেমসাইড করে বসে?'
'ত্বাষ্ট্র।'
'ভেরি গুড।'

যাক বাবা, পাশ করে গেছি। ইদানীং রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে বলে স্ট্রেপ্‌ল রীডিং। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমিও পড়ছি। আর তাতে কোন আপশোষ নেই। এ ত আর ওষুধ গেলা না, এ হল একধার থেকে নন্‌স্টপ ভূরিভোজ। গল্পের পর গল্পের পর গল্প। ফেলুদা বলে ইংরিজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে—আনপুটডাউনেব্‌ল। যে বই একবার পড়ব বলে পিকআপ করলে আর পুট ডাউন করবার জো নেই। রামায়ণ-মহাভারত হল সেইরকম আনপুটডাউনেব্‌ল। ফেলুদার হাতে এখন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড। আমারটা অবিশ্যি কিশোর সংস্করণ। লালমোহনবাবু বলেন ওঁর নাকি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকখানি মুখস্থ; ওঁর ঠাকুমা পড়তেন, সেই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নেই; ভাবছি একটা জোগাড় করে জটায়ুর স্মরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দী অবস্থায় পুজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎটা একটু কম।

বই থেকে মুখ তুলে রাস্তার দরজাটার দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা খুনের রহস্য সমাধান করে গত শুক্রবার ফিরেছে ফেলুদা। এখন আয়েশের মেজাজ, তাই বোধহয় বেলের শব্দে তেমন আগ্রহ দেখাল না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে মাসে একটা করে কেস পেলেই ওর দিব্যি চলে যায়। জটায়ুর ভাষায় ফেলুদার জীবনযাত্রা 'সেন্ট পার্সেন্ট অনাড়ম্বর'। এখানে বলে রাখি জটায়ুর জিভের সামান্য জড়তার জন্য 'অনাড়ম্বর'টা মাঝে-মাঝে 'অনারম্বড়' হয়ে যায়। সেটা শোধরাবার জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেনটেন্স গড়গড় করে বলা অভ্যেস করতে বলেছিল; সেটা হল—'বারো হাঁড়ি রাবড়ি বড় বাড়াবাড়ি।' ভদ্রলোক একবার বলতে গেয়েই চারবার হোঁচট খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, 'নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে; তারপর হয়ত দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তার কল্পনার অনেক তফাত।' তাই বলছি, ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর রং ফর্সা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, কানের দু' পাশের চুল পাকা, থুতনির মাঝখানে একটা আঁচিল, পরনে ছাই রঙের সাফারি সুট। ঘরে ঢুকে যেভাবে গলা খাঁকরালেন তাতে একটা ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে, আর খাঁকরানির সময় ডান হাতটা মুখের কাছে উঠে আসাতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবীভাবাপন্ন।

'সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারি নি,' সোফার একপাশে বসে বললেন আগন্তুক—'আমাদের ওদিকে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খোঁড়াখুঁড়িতে শহরের কী অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

'আমার নাম সুবীর দত্ত।' গলার স্বরে মনে হয় দিব্যি টেলিভিশনে খবর পড়তে পারেন। —'ইয়ে, আপনিই ত প্রাইভেট ইনভেস্‌—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি আমার দাদার ব্যাপারে।'

ফেলুদা চুপ। মহাভারত বন্ধ অবস্থায় তার কোলের উপরে, তবে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল গোঁজা রয়েছে।

'অবিশ্যি তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। আমি করবেট অ্যান্ড নরিস কম্পানীতে সেল্‌স এগজিকিউটিভ। ক্যামাক স্ট্রিটের দীনেশ চৌধুরীকে বোধহয় আপনি চেনেন; উনি আমার কলেজের সহপাঠী ছিলেন।'

দীনেশ চৌধুরী ফেলুদার একজন মক্কেল সেটা জানতাম।

'আই সী'—ভীষণ সাহেবী কায়দায় গম্ভীর গলায় বলল ফেলুদা। ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন—

'দাদা এককালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। নীহার দত্ত। ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। এখানে নয়, আমেরিকায়। মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটিতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্লোশন হয়। দাদার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়; কিন্তু শেষে

ওখানকারই হাসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যায় নি।'

'অন্ধ হয়ে যান?'

'অন্ধ। সেই অবস্থায় দাদা দেশে ফিরে আসেন। ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন; অ্যাক্সিডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর দাদা বিয়ে করেন নি।'

'তাঁর গবেষণাও তো তাহলে শেষ হয় নি?'

'না। সেই দুঃখেই হয়ত দাদা প্রায় মাস ছয়েক কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত মাথাখারাপ হয়ে গেছে। শেষে ক্রমে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'এখন কী অবস্থা?'

'বিজ্ঞানে এখনও উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায়। একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওঁর হেল্‌পার বা সেক্রেটারি বলতে পারেন—সেও বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল— তার একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো। এমনিতে যে দাদা একেবারে হেল্‌পলেস তা নন; বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাদে একাই লাঠি হাতে পায়চারি করেন। এমনকি বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে-মাঝে হেঁটে আসেন। বাড়িতে এঘর-ওঘর করার সময় ওঁর কোনোও সাহায্যের দরকার হয় না।'

'ইনকাম আছে কিছু?'

'বায়োকেমিস্ট্রির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল আমেরিকা থেকে, তার থেকে একটা রোজগার আছে।'

'ঘটনাটা কী?'

'আজ্ঞে?'

'মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা...'

'বলছি।'

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সুবীর দত্ত—

'দাদার ঘরে কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

ফেলুদা এতক্ষণে হাত থেকে মহাভারত নামিয়ে সামনের টেবিলের উপর রেখে প্রশ্নটা করল।

'দাদা নিজে বোঝেন নি। ওঁর চাকরটাও যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়। ন'টার সময় ওঁর সেক্রেটারি এসে ঘরের চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ডেস্কের দুটো দেরাজই আধখোলা, কাগজপত্র কিছু মেঝেতে ছড়ানো, ডেস্কের উপরের জিনিসপত্র ওলটপালট, এমনকি গোদরেজের আলমারির চাবির চারপাশে ঘষটানোর দাগ; বোঝাই যায় কেউ আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে।'

'আপনাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে ইদানীং?'

'হয়েছে। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে। পাড়ায় এখন দুটো পুলিশের লোক টহল দেয়। পাড়া বলতে বালিগঞ্জ পার্ক। আমাদের বাড়িটা প্রায় আশি বছরের পুরোন। ঠাকুর্দার তৈরি। খুলনায় জমিদারি ছিল আমাদের। ঠাকুর্দা চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। কলেজ স্ট্রিটে বড় দোকান ছিল আমাদের। বাবাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন ব্যবসা। বছর ত্রিশেক আগে উঠে যায়।'

'আপনার বাড়িতে এখন লোক ক'জন?'

'আগের তুলনায় অনেক কম। বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। আমার স্ত্রীও, সেভনটি ফাইভে। আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে জার্মানিতে। এখন মেম্বার বলতে আমি, দাদা আর আমার ছোট ছেলে। দুটি চাকর আর একটি রান্নার লোক আছে। আমরা দোতলায় থাকি। একতলাটা দু'ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি।'

'কারা থাকে সেখানে?'

'সামনের ফ্ল্যাটটাতে থাকেন মিঃ দস্তুর। ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। পিছনে থাকেন মিঃ সুখওয়ানি, অ্যান্টিকের দোকান আছে লিন্ডসে স্ট্রিটে।'

'এদের ঘরে চোর ঢোকে নি? শুনে তো বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।'

'পয়সা তো আছেই। ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার করে। সুখওয়ানির ঘরে দামি জিনিস আছে বলে ও দরজা বন্ধ করে শোয়। দস্তুর বলে বন্ধ ঘরে ওর সাফোকেশন হয়।'

'চোর আপনার দাদার ঘরে ঢুকেছিল কি নিতে অনুমান করতে পারেন?

'দেখুন, দাদার অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র দাদার আলমারিতেই থাকে, আর সেগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সাধারণ চোর আর তার মূল্য কি বুঝবে? আমার ধারণা চোর টাকা নিতেই ঢুকেছিল। অন্ধ লোকের ঘরে চুরির একটা সুবিধে আছে সেটা তো বুঝতেই পারেন?'

'বুঝেছি।' বলল ফেলুদা, 'অন্ধ মানে বোধহয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, কারণ চেক সই করা ত...'

'ঠিক বলেছেন। বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে। আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই। সেই ব্যাঙ্কের টাকা সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে। আমার আন্দাজ হাজার ত্রিশেক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে।'

'চাবি কোথায় থাকে?'

'যতদূর জানি, দাদার বালিশের নিচে। বুঝতেই পারছেন, দাদা অন্ধ বলেই দুশ্চিন্তা। রাত্তিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাঠের বাইরে শোয় চাকর কৌমুদী—যাতে মাঝরাত্তিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে। ধরুন যদি তেমন বেপরোয়া চোর হয় আর চাকরের ঘুম না ভাঙে তা হলে তো দাদার আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকে না। অথচ পুলিশে উনি খবর দেবেন না। বলেন ওরা কেবল জানে জেরা করতে, কাজের বেলায় ঢুঢু, সব ব্যাটা ঘুষখোর ইত্যাদি। তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজি হলেন। আপনি যদি একবারটি আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে অন্তত প্রিভেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। এমন কি বাইরের চোর না ভেতরের চোর সেটাও একবার—'

'ভেতরের চোর?'

আমি আর ফেলুদা দু'জনেই উৎকর্ণ মানে কান খাড়া।

ভদ্রলোক চুরুটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে গলাটা যতটা পারা যায় খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবক্তা। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি ঢেকেঢুকে কথা বললে আপনার কোনও সুবিধে হবে না। প্রথমত, আমাদের দু'জন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না। সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনেক হল; আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরোন আর্টের জিনিস-টিনিশ কেনে তেমন লোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে নয়। পুলিশের নজর আছে ওর ওপর।'

'আর অন্য ভাড়াটে?'

'দস্তুর এসেছে মাস চারেক হল। ও ঘরটায় আমার বড় ছেলে থাকত। সে পার্মানেন্টলি দেশের বাইরে। ডুসেলডর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। দস্তুর লোকটা সম্বন্ধে বদনাম শুনি নি, তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর, ইয়ে—'

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে,

দৃষ্টি ছাইদানিটার দিকে রেখে।

'শঙ্কর, আমার ছোট ছেলে, একেবারে সংস্কারের বাইরে চলে গেছে।'

ভদ্রলোক আবার চুপ। ফেলুদা বলল, 'কত বড় ছেলে?'

'তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখি নি দিন।'

'কী করে?'

'নেশা, জুয়া, ছিনতাই, গুণ্ডাগিরি কোনটাই বাদ নেই। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খ্যাতি আছে সেটা ত বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদ্দিন টিকবে জানি না।'

'চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল?'

'রাত্তিরে খেতে এসেছিল—সেটাও রোজ আসে না—তারপর আর দেখি নি।'

ঠিক হল আজই বিকেলে আমরা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনো ঠিক কেস বলা যায় না, কিন্তু আমি জানি বিস্ফোরণে অন্ধ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের ব্যাপারটা ফেলুদার মন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরছে ধৃতরাষ্ট্র।

খবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণে উদীয়মান বাঙালী জীবরাসায়নিক নীহাররঞ্জন দত্ত-র চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবরটা খুঁজে বার করে দিতে সিধু জ্যাঠার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্যি দু' মিনিটে গেল ফেলুদা অ্যাদ্দিন ডুব মেরে থাকার জন্য তাকে ধমকানিতে। সিধু জ্যাঠা আমাদের সত্যি জ্যাঠা না হলেও আত্মীয়ের বাড়া। কোনো অতীতের ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধু জ্যাঠার কাছে যায়। তাতে কাজ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি ফুর্তিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তুলতেই সিধুজ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'নীহার দত্ত? যে ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিল? এক্সপ্লোশনে চোখ হারায়?'

বাপ্‌রে বাপ্! কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শ্রুতিধর। ফেলুদা বলে ফোটোগ্রাফিক মেমরি; একবার কোনো ইন্টারেস্টিং খবর পড়লে বা শুনলে তৎক্ষণাৎ মগজে চিরকালের মত ছাপা হয়ে যায়। '—কিন্তু সে ত একা ছিল না!'

এ খবরটা নতুন।

'একা ছিল না মানে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তার মানে, যদ্দুর মনে পড়েছে—' সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বুকশেল্‌ফের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বার করেছেন—'এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টনার ছিল—হ্যাঁ এই যে।'

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধু জ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দত্তের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালী বায়োকেমিস্ট, নাম সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে চৌধুরীর কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ সে ছিল ঘরের অন্যদিকে। এই চৌধুরীর জন্যই নাকি নীহার দত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আগুন নেভানো ও তৎক্ষণাৎ নীহার দত্তকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

'এই চৌধুরী এখন—?'

'তা জানি না', বললেন সিধু জ্যাঠা। 'সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারুর খবর নিই না। কী দরকার? আমার খবর ক'জন নেয় যে ওদের খবর আমি নেব? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তাহলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।'

॥ ২ ॥

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে বয়সের ছাপ পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির মালিকের যদি সে ছাপ ঢাকবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দত্ত পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। বাগানটা বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের চাকতির উপর একটা অকেজো ফোয়ারা, সেই গোলের দু' পাশ দিয়ে নুড়িবেছানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দার দিকে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে 'গোলোকধাম' দেখে ফেলুদা কৌতূহল প্রকাশ করতে সুবীরবাবু বললেন যে, ওঁর ঠাকুর্দার নাম ছিল গোলোকবিহারী দত্ত। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

গোলোকধাম যে এককালের দারুণ বাড়ি ছিল সেটা এখনো দেখলে বোঝা যায়। গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে শ্বেতপাথরের বাঁধানো ল্যান্ডিং-এর বাঁ দিক দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পর পর দুটো ফ্ল্যাট। বাঁদিকে একটা প্রকাণ্ড হলঘর, যেটা দত্তরা ভাড়া দেন নি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক খানাপিনা গানবাজনা হয়েছে।

হলঘরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাম। মাথার ওপর কাপড়ে মোড়া চিরকালের মতো অকেজো ঝাড়লণ্ঠন, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়াল গিল্ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুবীরবাবু বললেন, সেটা বেলজিয়াম থেকে আনানো। মেঝেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুবলে গিয়ে দাবার ছকের মত সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুবীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে ঘরের অন্ধকার খানিকটা দূর হল। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট্ খট্।

লাঠি আর চটি মেশানো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে মুহূর্তের জন্য থামল, আর তার পরেই লাঠির মালিকের প্রবেশ। সেই সঙ্গে আমরা তিনজনেই দণ্ডায়মান।

অচেনা গলার আওয়াজ পেলাম—'এঁরা এলেন বুঝি?'

গম্ভীর গলা, ছ' ফুট লম্বা চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এনার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবী আর সিল্কের পায়জামা। বিস্ফোরণ যে শুধু চোখই নষ্ট করেনি, মুখের অন্যান্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ল্যাম্পের চাপা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। 'বোস, দাদা।'

'বসছি। আগে এঁদের বসাও।'

'নমস্কার', ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।'

আমিও খাটো গলায় একটা নমস্কার বলে দিলাম। শুধু হাতজোড় করাটা তো অন্ধ লোকের কাছে মাঠে মারা যাবে।

'আমারই মত হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্তির মশাইয়ের, আর

কাজিন বোধ করি পাঁচ সাত কি সাড়ে সাত।'

'আমি পাঁচ সাত', বলে ফেললেন তপেশরঞ্জন মিত্র।

মনে মনে ভদ্রলোকের আন্দাজের তারিফ না করে পারলাম না।

'বসুন এবং বোস' বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনের সোফায় বসে পড়লেন নীহার দত্ত। 'চায়ের কথা বলেছ?'

'বলেছি,' বললেন সুবীর দত্ত।

ফেলুদা অভ্যাসমত ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে গেল।

'আপনি যে রিসার্চ করছিলেন, সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার একজন পার্টনার ছিল, তাই না?'

সুবীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেছেন।

'পার্টনার নয়', বললেন নীহার দত্ত—'অ্যাসিস্ট্যান্ট। সুপ্রকাশ চৌধুরী। সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল। পার্টনার বললে বেশি বলা হবে। আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না।'

'তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন?'

'না।'

'অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি?'

'না। এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল।'

'বিস্ফোরণটা কি অসাবধানতার জন্য হয়?'

'আমি নিজে সজ্ঞানে কখনও অসাবধান হই নি।'

চা এল। ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে। সুবীরবাবুর দিকে আড়চোখে দেখলাম। তাঁরও যেন তটস্থ ভাব। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমাটার দিকে।

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়া আর রাজভোগ। আমি প্লেটটা হাতে তুলে নিলাম। ফেলুদার যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল—

'আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তাহলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে!'

'সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই।'

'সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনোও কাজ করেন নি সেটা আপনি জানেন?'

'এটুকু জানি যে আমার নোট্‌স ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। গবেষণার শেষ পর্বের নোট্‌স আমার কাছে ছিল আমার ব্যক্তিগত লকারে। তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্যি ছিল না। সেসব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে। এটা জানি যে গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। ক্যান্সারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে যেত।'

ফেলুদা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে। আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুদার মত খুঁতখুঁতে লোককেও খুশি করবে। কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না।

ঘরের বাতি নিভে গেছে। লোডশেডিং।

'ক'দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে,' সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সুবীরবাবু। —'কৌমুদী!'

বাইরে এখনও অল্প আলো রয়েছে; সেই আলোতেই সুবীরবাবুর চাকরের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বাতি গেল বুঝি?' প্রশ্ন করলেন নীহার দত্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতে আমার কিছু এসে যায় না।'

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। ছ'টা।

সুবীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

মাঝের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিন্দু। মোমবাতির শিখার ছায়া।

ফেলুদা চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার গবেষণার নোট্‌স যদি অন্য কোনো বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি?'

'নোবেল প্রাইজটা যদি লাভ বলে মনে করেন তাহলে হতে পারে বৈকি।'

'আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য চোর আপনার ঘরে ঢুকেছিল?'

'সেরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আরেকটা প্রশ্ন। আপনার এই নোট্‌সের কথা আর কে জানে?'

'বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। আর জানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রেটারী রণজিৎ।'

'বাড়ির লোক বলতে কি একতলার দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন?'

'তারা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এরা ব্যবসাদার লোক। জানলেও কোনো ইন্টারেস্ট হবার কথা না। অবিশ্যি আজকাল তো সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে; এ ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেন। বিজ্ঞানী হলেই তো আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না।'

নীহারবাবু উঠে পড়লেন; সেইসঙ্গে আমরাও।

'আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চৌকাঠের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখবেন বৈকি। সুবীর দেখিয়ে দেবে। আমি ছাদে সান্ধ্যভ্রমণটা সেরে আসি।'

করিডরে বেরিয়ে এলাম চারজনে। অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এসেছে। করিডরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরগুলোর ভিতর থেকে মোমবাতির ক্ষীণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করে ছাদের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'স্টেপ গোনা আছে। সতের স্টেপ গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সিঁড়ি। সেভেন প্লাস এইট—পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...'

॥ ৩ ॥

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরোন আমলের খাট। খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আর তার পাশে রাঙতায় মোড়া গোটা দশেক বড়ি। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিঠে অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বেতের বুনুনিতে কালসিটে পড়ে গেছে। মনে হল এই আরাম কেদারাতেই বেশিরভাগ সময় কাটান নীহারবাবু।

এছাড়া আছে একটা কাজের টেবিল—যার উপর এখন একটা মোমবাতি টিমটিম করছে—একটা স্টিলের চেয়ার, টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম, চিঠির র‍্যাক, একটা পুরোন টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দরজার ঠিক বাঁয়ে, রয়েছে গোদরেজের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদা তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গর্তটা ভালো করে দেখে বলল,

'খোলার চেষ্টার অভাব হয়নি। গর্তের চারপাশে দাগ।' তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বড়ির পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'সোনেরিল।...বুঝেছিলাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ খান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।'

তারপর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানো চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঘুম ভাঙল না? তুমি কিরকম পাহারা দাও বাবুকে?'

কৌমুদীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুবীরবাবু বললেন, 'ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিনবার না ডাকলে ওঠে না।'

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগেই; এবার একটি বছর ত্রিশের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চোখে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুবীরবাবু আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম ইনিই নীহারবাবুর সেক্রেটারি, নাম রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কে জিতল?'

ফেলুদার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, করা হয়েছে সেক্রেটারি মশাইকে। রণজিৎবাবুর ফ্যালফেলে ভাব দেখে ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনার পাতলা টেরিলিনের সার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফয়েল। তার উপর রোদে মুখ ঝলসানো—লিগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন?'

'ইস্টবেঙ্গল',- হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুবীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিস্ময় মেশানো হাসি।

'আপনি এখানে কদ্দিন কাজ করছেন?'

'চার বছর।'

'নীহারবাবু তাঁর বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় কখনো কিছু বলেছেন?'

'আমি জিগ্যেস করেছিলাম', বললেন রণজিৎবাবু, 'কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চান নি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি মাঝে-মাঝে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন।'

'আর কিছু বলেন?'

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে শুনেছি যে, উনি যে এখনো বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে ওঁর একটা কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ আমি জিগ্যেস করতে সাহস পাই নি। মনে হয় উনি এখনো আশা রাখেন যে ওঁর গবেষণাটা শেষ করবেন।'

'নিজে ত আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এটাই হয়ত ভেবেছেন। তাই নয় কি?'

'তাই বোধহয়।'

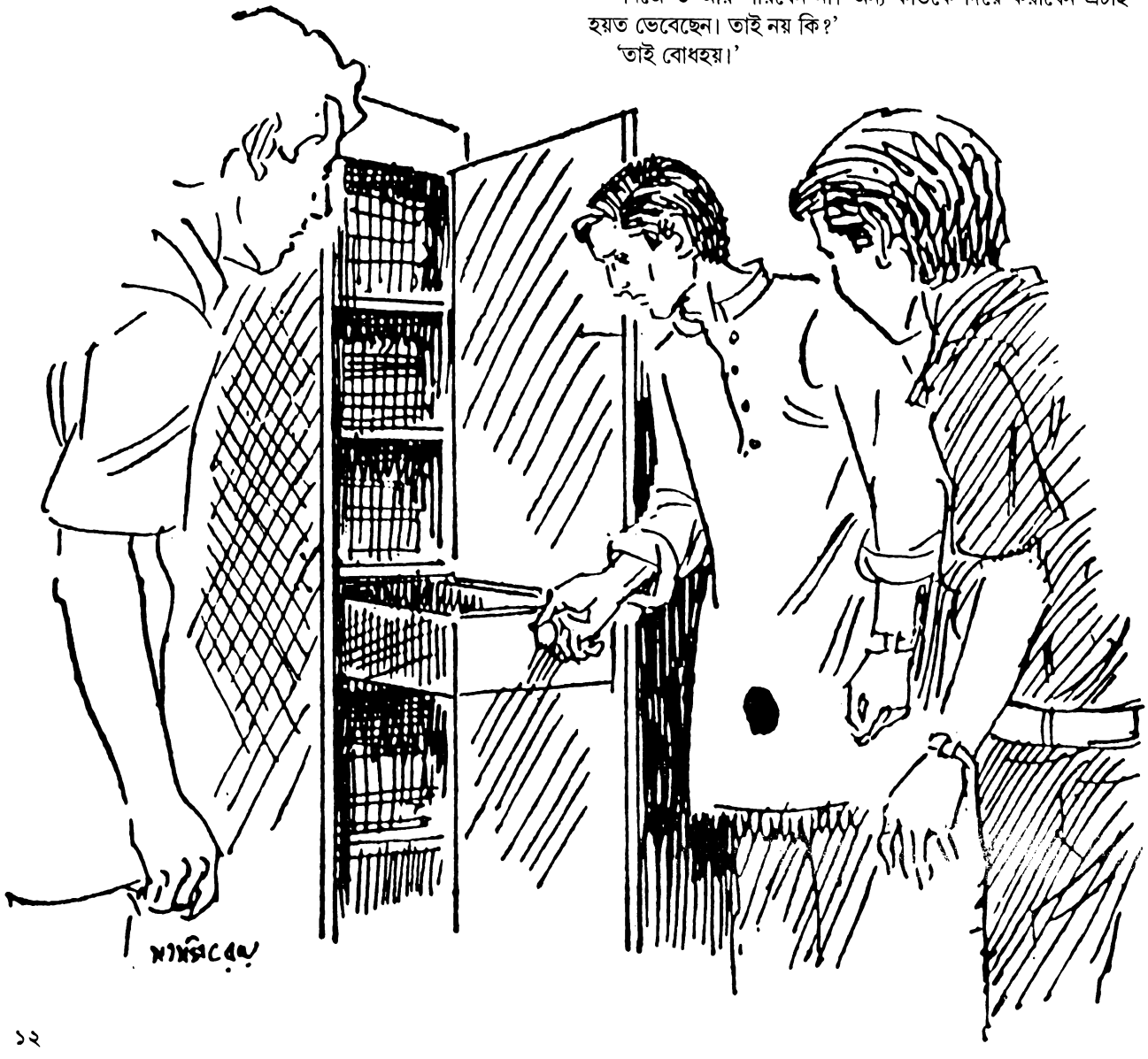

'আপনার এখানে ডিউটি কতক্ষণ?'

'ন'টায় আসি, ছ'টায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, উনি আপত্তি করেননি। তবে বাইরে গেলেও সন্ধেবেলা একবার এখানে হয়ে যাই। যদি ওঁর কোনো...'

'গোদরেজের চাবি কোথায় থাকে?' ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল। 'টাকা আর গবেষণার নোট্‌স কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।'

'ওই বালিশের নিচে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আনল। তারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আলমারি খুলল।

'টাকা কোথায় থাকে?'

'ওই দেরাজে।' রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুদা দেরাজটা টেনে খুলল।

'সে কী!'

রণজিৎবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দেরাজের মধ্যে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুষ্ঠী—আর একটা কাশ্মীরী কাঠের বাক্সে কিছু পুরোন চিঠিপত্র। আর কিচ্ছু নেই।

'এ কী করে হয়?'—রণজিৎবাবুর গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না। —'তিনটে বাণ্ডিল করা একশো টাকার নোট... সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ হাজার...'

'গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য দেরাজটায়?'

রণজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফেলুদা দ্বিতীয় দেরাজটা খুলল।

এটা একেবারেই খালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্ খট্। নীহারবাবু ছাদ থেকে নামছেন।

'মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটির একটা লম্বা সীলমোহর লাগানো খামে ছিল গবেষণার নোট্‌স....' রণজিৎবাবুর গলা খটখটে শুকনো।

'আজ সকালে ছিল টাকা আর কাগজপত্র?'

'আমি নিজে দেখেছি', বললেন সুবীরবাবু। 'একশো টাকার নোটের নম্বরগুলো সব নোট করা আছে। দাদাই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করতেন।'

ফেলুদা থমথমে ভাব করে বলল, 'তার মানে গত মিনিট পনেরোর মধ্যে—অর্থাৎ লোড শেডিং হবার পরেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা যখন বৈঠকখানায় ছিলাম তখন।'

নীহারবাবু ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইরে থেকে সব শুনেছেন।

আমরা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বোঝেন! গোয়েন্দার নাকের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল।'

'সামনের সিঁড়ি ছাড়া দোতলায় ওঠার অন্য সিঁড়ি আছে?' নীহারবাবুর ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

সুবীরবাবু বললেন, 'জমাদারের সিঁড়ি আছে পিছন দিকে।'

'লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয়?'

'তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে তো ঘড়ি মেলাতে শুরু করেছে। ছ'টায় যায়, আসে দশটায়।'

ভাবতে চেষ্টা করলাম ফেলুদার গোয়েন্দা জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেছে কিনা। একটাও মনে পড়ল না।

'নিচের বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি?' সিঁড়ির মুখটায় এসে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সেটা একবার খোঁজ করা যেতে পারে', বললেন সুবীরবাবু, 'মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।'

নিচের ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির উল্টোদিকে মিঃ দস্তুরের ঘরের দরজা। সেটা এখন বন্ধ আর ঘর যে অন্ধকার সেটা বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

'সুখওয়ানির ঘরে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে', বললেন সুবীরবাবু।

বাড়ির পুব দিক দিয়ে বাগানের পাশের পথ দিয়ে সুখওয়ানির ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। ঘরে ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, ব্যাটারি লাইট, যেমন আজকাল চালু হয়েছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদার টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝার উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন—

'একটু আসতে পারি কি?'

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পালটে গেল।

'সার্টন্‌লি, সার্টন্‌লি!'

ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'ইউ সী, মিস্টার মিটার—আমার ঘরভর্তি ভ্যালুয়েব্‌ল জিনিস। চুরির কথা শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। আজ সকালে যখন শুনলাম যে রাত্রে চোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা!'

সত্যি, এত দামী জিনিস যে একটা ঘরে থাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না। তাণ্ডবমূর্তি, ভৈরবমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ব্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ। তাছাড়া ছবি, বই, পুরোন ম্যাপ, নানারকম পাত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আতরদান এসব তো আছেই। ফেলুদা পরে বলেছিল, 'টাকা থাকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে ফেলতাম রে তোপ্‌সে!'

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে বললেন তিনি নাকি লোড শেডিং-এর ঠিক দশ মিনিট আগে ফিরেছেন।

'এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি? দোতলায় যাবার একটা সিঁড়ি রয়েছে আপনার ঘরের পিছনেই; ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ পেয়েছিলেন?'

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন। 'আর তাছাড়া এই অন্ধকারে দেখার প্রশ্ন আর উঠছে কি করে? আর ইয়ে, ভালো কথা, আপনারা কি বাইরের লোককে সন্দেহ করছেন?'

'কেন বলুন ত?'

'আপনারা মিঃ দস্তুরের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

ভাবটা যেন আমরা দস্তুরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার। আমি জানি আমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এরকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়চ্ করছি। গোড়ায় আলাপ হবার আগে শুধু ওর নাকডাকার শব্দ পেতাম ওর জানালা দিয়ে। আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌঁছে যায়।'

সুবীরবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলে নি।

'তারপর আলাপ হয়, যখন একদিন সকালে ও আমার টাইপরাইটার ধার নিতে আসে। আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে যেরকম লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল সেটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি।

সাধারণ কৌতূহলবশে জিগ্যেস করলাম ও কী করে। বলল ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। আরে বাপু, তাই যদি হবে, তা হলে এই লোড শেডিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাখার ব্যবস্থা কর নি কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।'

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেরোবার আগে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দত্তকে জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।'

পুবের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনর সময়ই একটা ট্যাক্সির হর্ন পেয়েছিলাম, এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। আবছা আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রংটা বোধহয় বেশ ফরসাই। হাতের ব্রীফকেসটা দেখে নতুন বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুবীরবাবু তাঁকে গুড ইভনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড ইভনিং শুনতে অভ্যস্ত নন।

'গুড ইভনিং, মিঃ ভাট্।'

অদ্ভুত খ্যানখ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, ফেলুদা চাপা ফিসফিসে গলায় সুবীরবাবুকে বললেন, 'ওকে থামান।'

সুবীরবাবু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন।

'ইয়ে, মিঃ দস্তুর!'

দস্তুর থামলেন। সুবীরবাবুর সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুবীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এইমাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল? ইওর ব্রাদার মাস্ট বি টেরিব্‌লি আপসেট!'

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় মানুষের গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেনাই যায় না। মিঃ দস্তুর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো স্বরে এই কথাগুলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যানখ্যানে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় মনে হয় যেন আরেকজন মানুষ কথাটা বলল।

'আপনি যখন এলেন তখন কাউকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই না ত?' বললেন মিঃ দস্তুর। 'অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে দেখতে পাইনি। থ্যাঙ্ক গড যে আমার ঘরে কোনো মূল্যবান জিনিস নেই!'

'কে?'

প্রশ্নটা এল দোতলার ল্যান্ডিং থেকে। নীহারবাবুর গলা। আমরা সবাই গাড়িবারান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে ঢুকে উপরে চেয়ে দেখলাম অন্ধকারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে।

'ঈটস্ মী, মিস্টার ডাট্,' দৃষ্টি উপরে করে বললেন দস্তুর— 'আপনার ভাই এইমাত্র আপনার লস্-এর কথাটা বলল। আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

চশমাটা সরে গেল। আর তার পরেই মিলিয়ে এল চটি আর লাঠির শব্দ।

'আপনারা একটু বসে যাবেন না আমার ঘরে?' বললেন মিঃ দস্তুর। 'সারাদিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভালো লাগে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। তার কারণ অবিশ্যি আমি জানি। যে বাড়িতে ক্রাইম ঘটেছে, সে বাড়ির লোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়ার কাজ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দস্তুরের বৈঠকখানার নেড়া ভাবটা সত্যিই দেখবার মত।। আসবাব বলতে একটা সোফা, দুটো কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেল্‌ফ। সোফার সামনে একটা নিচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট। তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল। ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল ; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভদ্রলোক ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন বোধহয় চাকরকে ডাকতে ; ফিরে আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল।

'নো, থ্যাঙ্কস্। ক্যান্সারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'অন্যের ধূমপানে আশা করি আপত্তি নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে অলরেডি একটা আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।'

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমারই ব্র্যান্ড।' চারমিনারের টুকরো আমিও দূর থেকেই চিনতে পারি।'

দস্তুর বলল, 'অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মত আমিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই। তারপর যখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতকরা নব্বই ভাগ লোককে গরম আর অন্ধকার ভোগ করতে হচ্ছে, তখনই মনটা খারাপ হয়ে যায়। সেই কারণে আমিও...'

'আপনার ত ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুডস্-এর ব্যবসা?'

'ইলেক্‌ট্রিক্যাল?'

'সুখওয়ানি যে বলছিলেন—'

'সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল নয়, ইলেক্‌ট্রনিক্স। বছরখানেক হল শুরু করেছি।'

'আপনি নিজেই?'

'না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে। আমি বোম্বাই-এর লোক, তবে অনেকদিন দেশের বাইরে। জার্মানিতে একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা থেকে লিখল এখানে চলে আসতে। পয়সা ওর, আমি যোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।'

'কবে এলেন কলকাতায়?'

'গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম মাস তিনেক ; এই ফ্ল্যাটের খবরটা পেয়ে এখানে চলে আসি।'

চাকর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এল। থাম্‌স আপ। মিঃ দস্তুর ফেলুদার পরিচয় আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মিঃ মিটার, আমার ঘরে মূল্যবান জিনিস নেই ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিধে লোক নন। তার ঘরে নানারকম গোপন কারবার চলে। গর্হিত ব্যাপার।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার স্নানের ঘর আর ওর স্নানের ঘর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে মাঝে-মাঝে ওর শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।'

ফেলুদা গলা খাক্‌রিয়ে বলল, 'এইভাবে কান লাগানোও একটা গর্হিত ব্যাপার নয় কি?'

মিঃ দস্তুর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, 'সেটা করতাম না। যখন দেখলাম যে, আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে খাম খুলে তারপর আবার আঠা দিয়ে সেঁটে ফেরত দেয়, তখন একটা পালটা দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। কিন্তু উনি যদি আমার পিছনে লাগেন তা হলে

আমিও ওকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।'

কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গেটের কাছে এসে ফেলুদা দারোয়ানকে জিগ্যেস করল গত আধ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে কিনা। সে বলল সুখওয়ানি আর দস্তুরকে ছাড়া কাউকে দেখে নি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারদিক ঘিরে। পিছনদিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ কয়েক মাস যাবৎ। জোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসায় কোনো অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে এ কাজ বাড়ির লোকেই করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের লোককে দিয়ে কাজটা করায়নি তারই বা বিশ্বাস কী?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুদা বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

'পুলিশে একটা খবর দিলে ভাল করতেন কিন্তু।'

ফেলুদার এ প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও বেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, 'কেন বলছেন বলুন ত!'

'পুলিশ সম্বন্ধে আপনার দাদার ধারণা যাই হোক না কেন, পলাতক চোর ধরার যে সব উপায় পুলিশের আছে কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের তা নেই। বিশেষ করে যখন এতগুলো টাকা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নোটের নম্বর লেখা আছে বলছেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

সুবীরবাবু বললেন, 'আপনাকে যখন আসতে বলেছি এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাদ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু আমিই নিশ্চিন্ত হব না, দাদাও হবেন। অবিশ্যি, সত্যি বলতে কি, চোর যে কে সেটা কারুর সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।'

'আপনার ছেলের কথা বলছেন কি?'

সুবীরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। —'এ শঙ্কর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছ'টায় বাতি নিভে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তারপর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ঘরে ঢুকে আলমারি খোলা—এসবই ত তার কাছে নস্যি!'

'কিন্তু নীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার খুব যাতায়াত আছে?'

'সেটার দরকার কি বলুন! সে ত সেই কাগজপত্রের বিনিময়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাকা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দাদার কাছে কতখানি সেটা ত সে খুব ভালোভাবেই জানে!'

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটার ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তারপরেও একই দিনে যে আরও কিছু ঘটতে পারে সেটা ভাবতেই পারি নি। অবিশ্যি সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুদা আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিবোচ্ছে আর চারমিনার ফুঁকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। যে প্রশ্নটা গোলোকধাম থেকেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

'তুমি কেসটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেন ফেলুদা?'

ফেলুদা পরপর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে বলল, 'কারণ আছে রে, কারণ আছে।'

'কারণ তো বললেই তুমি—পালানো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরও সহজ—বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।'

'সুবীরবাবুর ছেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয়?'

'আর কে নেবে বল। বাড়ির লোক নিয়েছে সে ত বোঝাই যাচ্ছে। দস্তুর ত ছিলেনই না। সুখওয়ানি চুরি করে দিব্যি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও যেন কেমন-কেমন লাগে। রণজিৎবাবুও এলেন চুরির পরে। আর আছে চাকরবাকর...'

'কিন্তু ধর যদি মক্কেল নিজেই কিছু করে থাকেন?'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুদার দিকে।

'সুবীরবাবু!'

'একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিষ্কারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখ।'

আমি চোখ বুজে কল্পনা করলাম আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুদার হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর—

ধাঁ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

'লোডশেডিং-এর সঙ্গে-সঙ্গে সুবীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুদা—চাকরকে ডাকতে!'

'তবে!— ভেবে দেখ, আমার পোজিশনটা কী হবে যদি বেরোয় যে সুবীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় এই কারণেই যে ওই একটি লোক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলছেন সেটা অবিশ্যি অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু ধর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা জুয়োর আড্ডায় ভদ্রলোকের অনেক টাকা খোয়া গিয়ে থাকে, বাজারে একগাদা ধারদেনা থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে টাকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কী?'

'কিন্তু উনি ত নিজেই এলেন তোমার কাছে! উনিই ত তোমায় গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেন!'

'উনি যদি খুব উচ্চস্তরের ধূর্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে নিজের উপর যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্যে ঠিক ওই কাজটাই করা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

এর পরে আর কোনও কথা বলা যায় না।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম।

বসবার ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম। স্কুটার। একটা নয়, একটার বেশি।

নির্জন-নিস্তব্ধ পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সামনেই এসে থামল।

আর তার পরেই আমাদের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

দিনকাল ভালো নয়; আর তাছাড়া আমাদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে বেটাইমে লোক এলেও স্কুটারে আসে না।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার পর্দাটা ফাঁক করে একবার উঁকি দিলাম। ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে। বলল—'দাঁড়া।' অর্থাৎ তুই খুলিস না, আমি খুলছি।

দরজা খুলতেই যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যে শয়তানের অবতার সেটা বুঝতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না। বসবারও দরকার নেই; ঘরে ঢুকে পিঠ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফেলুদার দিকে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুবীর দত্তর ছেলে শঙ্কর দত্ত।

'শুনুন মশাই, আমার বাবা আমার বিষয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি। এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার

পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে কারুর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি ; আমি একা নই। আমাদের গ্যাং আছে। বেশি ওস্তাদী করলে পস্তাবেন। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব এই বলে দিলাম।'

শঙ্কর দত্ত যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পীচ ঝাড়া শেষ করে। তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে স্কুটার স্টার্ট নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। স্নায়ুর উপর অসাধারণ দখল আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর। ও বলে প্রচণ্ড রাগে যে ফেটে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি।

স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা ঝড়ের বেগে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে।

'চ' তোপ্‌সে—ট্যাক্সি...'

তিন মিনিটের মধ্যে সাদার্ন এভিনিউতে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লাম দু'জনে। উত্তরদিকে গেছে স্কুটারগুলো এটা জানি।

'ল্যানসডাউন ধরুন', বলল ফেলুদা। বড় রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি, তাই ল্যানসডাউন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সাদার্ন এভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সিচালক বাঙালী, আমাদের মুখ চেনা। বললেন, 'কাউকে ফলো করবেন, স্যার?'

'তিনটে স্কুটার', চাপা গলায় বলল ফেলুদা।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শঙ্কর একাই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দু'জন করে লোক। এরা সব মার্কামারা মস্তান সেটা আর বলে দিতে হয় না। আমাদের ট্যাক্সি ওদের লেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রীটে পড়ে বাঁ দিকে ঘুরল। এঁকেবেঁকে সাপের মতো চালানোয় বোঝা যাচ্ছে এদের বেপরোয়া ফূর্তির ভাবটা। ফেলুদা রাস্তার আলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কি খেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মির্জা গালিব স্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘুরল। মার্কুইস স্ট্রীট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অন্ধকার, বাতিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুদার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাক্সির স্পীড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আরো দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

'চালিয়ে বেরিয়ে যান', বলল ফেলুদা।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কোরিনথিয়ান লজ। নিউ? বাড়ির বয়স কম করে একশো বছর।

ফেলুদার কাজ শেষ। বুঝলাম এদের ডেরাটা জানার দরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারটা চল্লিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

পরদিন ভোরে সিধু জ্যাঠার আবির্ভাবটা একেবারে আন্‌এক্সপেকটেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন জানি, কিন্তু সেটা লেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মানেই কোনও একটা বিশেষ কারণ আছে।

'খাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি', বললেন সিধু জ্যাঠা। —'সুপ্রকাশ কিনা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।'

'কবেকার খবর?'

'উনিশশো একাত্তর। মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানির উপর পুলিশের হামলায় একটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, নাম এস. চৌধুরী। ভেজাল ড্রাগের ব্যবসা চালাচ্ছিল ; তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। লোকটার জেল হয়। এইটুকুই খবর। আসলে মাথায় ঘুরছে সুপ্রকাশ, তাই এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারি নি। অবিশ্যি এ সেই একই এস. চৌধুরী কি না—'

'একই', গম্ভীর ভাবে বলল ফেলুদা।

সিধু জ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে থাকবে। ফেলুদার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে, মালকোচাটা একটু ভালো করে গুঁজে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুদা খাতা খুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরপর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন?

২) 'কে'-র অর্থ কী?

৩) অসমাপ্ত কাজটা কী?

প্রশ্নগুলো পড়ে সে সম্বন্ধে আমিও খানিকটা না ভেবে পারলাম না।

আলমারির চাবির গর্তের চারিধারে আঁচড় কালই ফেলুদার টর্চের আলোয় দেখেছিলাম। এটায় খটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। রীতিমত জোরে ঘষা না লাগলে ইস্পাতের ওপর ওরকম দাগ পড়তে পারে না। নীহারবাবুর ঘুম কি এতই গভীর যে এত ঘষাঘষিতেও ঘুম ভাঙবে না?

'কে'-র ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপর মনে পড়ল যে মিঃ দস্তুরের গলা শুনে দোতলার ল্যান্ডিং থেকে নীহারবাবু 'কে' বলে উঠেছিলেন। ফেলুদা এই 'কে' প্রশ্নে খটকার কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমাপ্ত কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই বলেন। সেটা যে উনি ওঁর গবেষণার বিষয় বলছিলেন সেটা কি ফেলুদা বিশ্বাস করে না?

ফেলুদা আরও কি সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওর ঘরেই এক্সটেনশন ফোন ; বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো।'

দু' চারবার হুঁ-হুঁ করে এবং শেষে 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে ফোনটা রেখে ফেলুদা আলনা থেকে সার্ট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাঙ্গারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।'

আমার বুক ধড়াস।

'কে খুন হল?'

'মিঃ দস্তুর।'

বড় রাস্তা থেকে বালিগঞ্জ পার্কে ঢুকতেই দূরে সাতের একের সামনে দেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটলা। তাও সাহেবী পাড়া বলে রক্ষে, নইলে ভীড় আরও অনেক বেশি হত।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না এমন লোক নেই। গোলোকধামে ঢুকতেই ওকে দেখে ইনস্পেক্টর বকশী হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসে পড়েছেন? গন্ধে-গন্ধে হাজির?'

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, 'সুবীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি ; ফোন করেছিলেন, তাই চলে এলাম।

আপনাদের কাজে কোনও ব্যাঘাত করব না গ্যারান্টি দিচ্ছি। খুনটা হল কিভাবে?'

'মাথায় বাড়ি। একটা নয়, তিনটে। ঘুমন্ত অবস্থায়। লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য। ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন। আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে।'

'লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন?'

'খুব গণ্ডগোল। সুটকেস গুছোতে শুরু করেছিল। সটকাবার তালে ছিল।'

'টাকাকড়ি গেছে কিছু?'

'মনে ত হয় না। খাটের পাশের টেবিলে ওয়লেটে শ'তিনেক টাকা রয়েছে। বাড়িতে ক্যাশ বেশি রাখত বলে মনে হয় না। অথচ ব্যাঙ্কের জমার খাতা, চেক বই এসব কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে। এখনও ভাল করে সার্চ করা হয় নি; এবার করবে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নি।'

সুবীরবাবু মিনিটখানেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুখওয়ানি বেজায় তম্বি করছে। বলছে তার নাকি একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ড্যালহাউসিতে। আমি বলেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।'

'ঠিকই বলেছেন', বললেন মিঃ বকশী। 'অবিশ্যি জেরাতে আপনিও বাদ যাবেন না।'

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী। সুবীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন।

'তবে আমার দাদাকে যত অল্পের উপর দিয়ে সারতে পারেন ততই ভালো।'

'ন্যাচারেলি।'

'ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'নিশ্চয়ই!'

বকশীও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি। ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুবীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল।'

'কখন!'—সুবীরবাবু অবাক।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলে বলল, 'সে কি কাল ফিরেছিল?'

'ফিরে থাকলেও টের পাই নি', বললেন সুবীরবাবু। 'সকালে উঠে তাকে দেখি নি।'

'যাক্, তা হলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সন্ধান পাওয়া গেল', বললেন মিঃ বকশী, 'ওই হোটেলটা মোটেই সুবিধের নয়। বার দুয়েক রেড হয়ে গেছে ওখানে অলরেডি।'

কালকের দেখা ঘরের চেহারা আজ একেবারে পালটে গেছে। কাল ছিল অন্ধকার, আর আজ পুবের দুটো জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে সোফা আর মেঝের উপর পড়েছে। আশ্চর্য লাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনও অ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। ঘরে দু'জন পুলিশের লোক রয়েছে, আর পুলিশের ফোটোগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম ব্যাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্যি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে ঢুকল। আমি চৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিছানার দিকে চেয়ে চাদরে ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক খানাতল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে একটা খোলা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে গতকাল দস্তুরের হাতে দেখা নতুন ব্রীফকেসটা।

আমি আরো মিনিট তিনেক বসবার ঘরে জিনিসপত্র দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

'চ' তোপ্‌সে।'

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। 'আপনি আছেন কিছুক্ষণ?' বকশী প্রশ্ন করল।

'একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব', বলল ফেলুদা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে বলবেন।'

সুবীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আরাম কেদারায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে খাটের উপর শোয়ানো। অ্যাদ্দিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার মাথা যে রূপো দিয়ে বাঁধানো সেটা বুঝতে পারি নি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা ছিল নীহারবাবুর ঠাকুর্দা গোলোকবিহারী দত্তর।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কাত করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, 'শব্দ পেয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ—এই দুই নিয়েই ত কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। লোকে বলে দুর্ভাগ্য। আমি ত জানি এটা ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। আপনি সেদিন জিগ্যেস করলেন বিস্ফোরণটা অসাবধানতার জন্য হয়েছিল কিনা; আজ আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির—সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার শ্রম পণ্ড করার জন্য। ঈর্ষা যে মানুষকে কত নিচে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোঝেন।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী?'

'বাঙালী যে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা আপনি মানেন কি?'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও যেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন যে কথাটা যেভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি?'

'না, বলি নি। কোনোদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলি নি। বলে কী করব? আমার সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে ত আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।'

'কিন্তু আপনাকে চিরকালের মত অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার কাগজপত্রগুলো হাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে?'

'নিশ্চয়ই তাই। তবে তার সে ধারণা ভুল। আমি তো বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।'

আমরা দু'জনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে দেখে বুঝতে পারছি সে গভীরভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুবীরবাবু কোনো কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, 'টাকার কথা জানি না, সেটা হয়ত পুলিশের পক্ষে উদ্ধার করা আরো সহজ, কিন্তু আপনার এত মূল্যবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।'

'আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বকশী ফেলুদাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খানাতল্লাসীর কী ফল হয় সেটা ফোনে জানিয়ে দেবেন।

'আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের খবরটাও জানাতে ভুলবেন না', বলে দিল ফেলুদা।

আমরা বাড়ি ফিরেছি সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুদা পায়চারি করে, থেমে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, ভ্রূকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ খটকা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির হুটোপাটি চলছিল। একবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'গোলোকধামের একতলার প্ল্যানটা তোর মোটামুটি মনে পড়ছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'মোটামুটি।'

'সুখওয়ানির ঘর থেকে দস্তুরের ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল ত?'

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, দুটো ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বারান্দাটা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বারান্দা দিয়েই সোজা এক ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া যেত।'

'ঠিক বলেছিস। তার মানে সুখওয়ানিকে যদি দস্তুরের ফ্ল্যাটে আসতে হয় তাহলে বা গান ঘুরে বাড়ি আর কম্পাউন্ড ওয়ালের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

'কিন্তু সামনের কোল্যাপ্‌সিব্‌ল গেট কি মাঝরাত্তিরে খোলা থাকবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে লাগল—

'X, Y, Z...X, Y, Z...X হল গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে—X, Y, Z, কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা...'

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'ফেলুদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুপ্রকাশ চৌধুরী দস্তুর সেজে নীহারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে ফেলুদা মোটেই আমার কথাটা উড়িয়ে দিল না। বরং আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল, 'যদিও এ ধারণাটা আমার মাথায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয় আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে-মাঝে বেশ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু দস্তুর যদি সুপ্রকাশ হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে সে গবেষণার নোটসের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তা হলে সেটা গেল কোথায়? আর তার পক্ষে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কি করে? সে ত দোতলায় কোনোদিন যায়ই নি।'

আমার সত্যিই মাথা খুলে গেছে। ব্যাপারটা ত জলের মত সোজা! বললাম, 'উনি যাবেন কেন? ধর যদি ওঁর সঙ্গে শঙ্কর দত্তর ষড় হয়ে থাকে? শঙ্করই কাগজটা চুরি করে ওকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্য কিছু টাকাও পেয়ে গেছে।'

'এক্সেলেন্ট' বলল ফেলুদা। 'অ্যাদ্দিনে বলা যায় তুই আমার উপযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হলি। কিন্তু এতে ত খুনের রহস্যের সমাধান হচ্ছে না।'

'ধর যদি রণজিৎবাবু বুঝে থাকেন যে দস্তুর আসলে সুপ্রকাশ। রণজিৎবাবু ত নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানেন, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দারুণ ভক্তিও করেন। যে লোক নীহারবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রোশে খুন করতে পারেন না রণজিৎবাবু?'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'খুন জিনিসটা অত সহজ নয় রে তোপ্‌সে। রণজিতের মোটিভটাকে মোটেই জোরালো বলা চলে না। আসলে আফশোষের ব্যাপার হচ্ছে যে দস্তুর লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সাবধানী লোক ছিলেন এই দস্তুর।'

'আমার কী মনে হয় জান ফেলুদা?'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম, 'পুলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তাহলে অনেক রকম ক্লু পেতে।'

'বলছিস?'

ফেলুদা নিজের ওপর কনফিডেন্স হারাচ্ছে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; কিন্তু ওর ওই 'বলছিস' কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম। আর তারপর যে কথাটা বলল, তাতে মনটা আরও দমে গেল।

'এই গরম আর এই লোডশেডিং-এ আইনস্টাইনেরও মাথা খুলত কিনা সন্দেহ।'

দুটো নাগাদ ইনস্পেক্টর বকশীর ফোন এল। দস্তুরের একটা জুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে অ্যামেরিকান ডলার আর জার্মান মার্ক মিলে প্রায় সতের হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন কোনো কাগজ বা দলিল পাওয়া যায় নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যায়। ইলেক্‌ট্রনিক্‌স-এর নতুন কোনো দোকানের হদিস মেলেনি, দস্তুরের কোনো বন্ধুরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটি মাত্র ব্যক্তিগত চিঠি, আর্জেনটিনা থেকে লেখা, যা থেকে বোঝা যায় যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছুদিন কাটিয়েছিল।

বকশীর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিনথিয়ান লজের ম্যানেজারকে ছবি দেখাতে সে শঙ্করকে চিনেছে; কাল সারারাত নাকি শঙ্কর কয়েকজন বন্ধুসমেত হোটেলের একটা ঘরভাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে। সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বকশী বললেন, এবার শঙ্করকে ধরা নাকি 'এ ম্যাটার অফ মিনিট্‌স'।

ফেলুদা সব শুনেটুনে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'শঙ্করবাবু যদি হোটেলের পেমেন্টটা চুরির টাকায় করতেন তাহলে খুব সুবিধে হত। যাই হোক, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করে নি, কারণ সেই সময়টা তার অ্যালিবাই ছিল।'

অ্যালিবাই কথাটার মানে অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না, তাদের বাঙলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল, 'ডিকশনারিতে যা লেখা আছে তাই লিখে দে'। তাই বলছি, অ্যালিবাই মানে হল—'অপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাইবার দাবী।' তার মানে 'আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিনথিয়ান লজে বসে জুয়া খেলছিলাম'—এটাই হবে শঙ্করের অ্যালিবাই।

টেলিফোনটা পেয়েও ফেলুদার উসখুস ভাব গেল না। তিনটে নাগাদ দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাউজারস পরেছে। বলল কতকগুলো তথ্যসংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে। ফিরল প্রায় সাড়ে চারটেয়। আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে শেষ করে ফেলেছি।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী নকুল সহদেব সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জুনের পতন হব-হব তখন ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ফেলুদার ফোন, গোলোকধাম থেকে সুবীরবাবু কথা বলতে চাইছেন।

ফেলুদা তার ঘরেই ফোন ধরল ; আমি বসবার ঘরের ফোনে কান লাগিয়ে দু' তরফের কথাই শুনে নিলাম।

'হ্যালো।'

'কে, মিঃ মিত্তির?'

'বলুন মিঃ দত্ত।'

'দাদার গবেষণার নোট্‌স সমেত সীল করা খামটা পাওয়া গেছে।'

'দস্তুরের ঘরে ছিল কি?'

'ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের তলায় সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। একদিকের সেলোটেপ খুলে গিয়ে খামটা ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথ।'

'আপনার দাদা জানেন খবরটা?'

'তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব এসেছে। কোনো ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সারাদিন চেয়ার ছেড়েওঠেন নি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।'

'আপনার ছেলের কোনো খবর আছে?'

'আছে। জি টি রোডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে।'

'আর চোরাই টাকা?'

'সেটা নিলেও অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি চুরির ব্যাপারটা শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।'

'খুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে?'

'ওরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তাছাড়া একটা নতুন ক্লু-ও পাওয়া গেছে। দস্তুরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।'

'কী লেখা আছে তাতে?'

'ইংরিজিতে এক লাইন হুমকি—"অতিরিক্ত কৌতূহলের পরিণাম কী জান তো?'

'সুখওয়ানি কী বলে?'

'সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তুরের ঘরে যাবার কোনো উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাড়াটে গুণ্ডা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।'

'হুঁ...ঠিক আছে, আমি একবার আসছি।'

ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'X আর Y তাহলে একই লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Z-কে নিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেসটিনেশন গোলোকধাম। তৈরি হয়ে নে তোপ্‌সে।'

॥ ৪ ॥

'আপনি চললেন নাকি?'

গোলোকধামের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি রণজিৎবাবু আসছেন। বাইরে পুলিশ দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন রণজিৎবাবু, 'নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।'

'উনি আছেন কেমন?'

'ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শক্ পেয়েছেন। প্রেসারটা ওঠানামা করছে।'

'কথা বলছেন কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলছেন', আশ্বাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

'যে খামটা পাওয়া গেছে দস্তুরের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার খুব তাড়া না থাকলে আর একবারটি চলুন ওপরে। আলমারিতে আছে ত ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে ত আর বিশেষ আসা-টাসা হবে না।'

'কিন্তু খাম ত সীল করা', কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

'তাহলেও আমি জিনিসটা একবার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে চাই।'

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অন্ধকার, দশটার আগে আলো আসবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া ছ'টা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যান্ডিং-এ কেরোসিন ল্যাম্প জ্বললেও আনাচে-কানাচে অন্ধকার। রণজিৎবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে সুবীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা আলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো সম্ভব হবে না।

'সেটা বলাই বাহুল্য', বলল ফেলুদা।

সুবীরবাবুকে দেখে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল। বললেন সারাদিন নাকি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে। 'তবে একটা ভাল এই যে, দাদার নামটা লোকে ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, 'নীহারবাবু আপনার নাম শুনেই বোধ হয় আপত্তি করলেন না। এমনিতেই কাউকে দেখতে দিতেন না।'

'আশ্চর্য', ফেলুদা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল গালার সীল, সামনের দিকে ওপরের বাঁ কোণে ছাপার হরফে লেখা "ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগ্যান, ইউ এস এ"। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুবীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবছা অন্ধকারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমারই মত।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি খামটার দিকে। তারপর দুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুলমাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে।

'বুঝেছিস তোপ্‌সে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ-বারো ধাঁচের হরফ আছে, আর ইংরিজিতে আছে কমপক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হরফের নাম হল গ্যারামন্ড।' —ফেলুদা খামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

'এই গ্যারামন্ড টাইপের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এইসব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু হয়। এমন কি সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, খুব ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এক দেশের গ্যারামন্ডের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারামন্ডের সূক্ষ্ম তফাৎ

রয়েছে। কয়েকটা বিশেষ-বিশেষ অক্ষরের গড়নে এই তফাৎটা ধরা পড়ে। যেমন এই খামের উপরের হরফটা হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারামন্ড, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান গ্যারামন্ড। এমন কি ক্যালকাটা গ্যারামন্ডও বলতে পারিস।'

ঘরে থমথমে স্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি খাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লন্ডনে মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিখ্যাত লোকের মূর্তির ছবি দেখেছি ; তার সব কিছু অবিকল মানুষের মত হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তাঁর দৃষ্টিহীন চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মূর্তির চোখের মত।

'কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধ্য হচ্ছি।'

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গির মাঝপথে থেমে গেলেন।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু' আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিঁড়ে গেল। তারপর সেই দু' আঙুলেরই আরেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ।

রুল টানা ফুলস্ক্যাপ।

তাতে শুধু রুলই আছে, লেখা নেই। অর্থাৎ যাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক পেপার।

কাচের চোখ এখন বন্ধ, মাথা হেঁট, দু' হাতের কনুই হাঁটুর উপর, হাতের তেলোয় মুখ ঢাকা।

'রণজিৎবাবু'—ফেলুদার গলা গম্ভীর—'আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাপ্পা, তাই না?'

রণজিৎবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ। ফেলুদা বলে চলল—

'আসলে রাত্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার। কারণ আপনি নিজেই চুরির জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সন্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা দেখা দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাপ্পাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুঝে আপনিই আলমারি খোলেন এবং খুলে দুটি কাজ সারেন—তেত্রিশ হাজার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার নোট্‌স হস্তগত করা। আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না ; এটা আপনি রাতারাতি ছাপিয়ে নিয়েছেন। এটার হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি?'

রণজিৎবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে দস্তুরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন! আমাকে বললেন, "বিশ বছর পরে লোকটার লোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে।" তখন ...'

'বুঝেছি। তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা দস্তুরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ। আপনিই ত পুলিশ চলে যাবার পর সেলোটেপ দিয়ে খামটাকে খাটের তলায় আটকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন—ঠিক এমন ভাবে নিচু হলেই সেটা চোখে পড়ে তাই না?'

রণজিৎবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'আমায় মাপ করবেন! আমি ফেরত দিয়ে দেব! টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিত্তির! আমি ... আমি লোভ সামলাতে পারি নি! সত্যি বলছি, আমি লোভ সামলাতে পারি নি!'

'ফেরত আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব সেটা বুঝতেই পারছেন।'

'আমি জানি,' বললেন রণজিৎবাবু।—'তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু যেন জানতে না পারেন। তিনি আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এ শক্ সহ্য করতে পারবেন না।'

'বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এত ভালো ছাত্র হয়ে এটা কী করলেন?'

রণজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাবির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অত অসাবধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে লোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হোক, আপনার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটা উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেক্রেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শর্ট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ?'

রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে আমার মত ফেলুদারও যে মায়া হচ্ছিল সেটা ওর পরের কথা থেকেই বুঝলাম।

'আপনি এবার বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকের জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যাতায়াত করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, সে যে চুরি করে নি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, 'একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি?'

'নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা, 'সেটাই ত আসল কাজ।'

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনারা এসেছেন?' চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন?'

'ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে,' নিচু গলায় ক্লান্ত ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমত শক্ত।

'আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে,' বলল ফেলুদা। 'বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।'

'সে আপনারা বুঝবেন।'

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এর পরে আর বিরক্ত করব না।'

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, 'বিরক্ত আর করবেন কী করে? বিরক্তির অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি!'

'তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খান নি?'

'না, খাই নি। আজ খাব।'

'তাহলে আসি আমরা।'

'দাঁড়ান।'

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুজনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—

'আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।'

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গম্ভীর। কিন্তু তা বলে আমি অত রহস্য বরদাস্ত করব কেন? চেপে ধরে বললাম, 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় চলবে না। সব খুলে বল।'

ফেলুদা উত্তরে রামায়ণে চলে গেল। ওর সাসপেন্স বাড়ানোর কিছু কায়দা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না।

'রামকে বনবাসে পাঠানোর ছ'দিন পর দশরথের হঠাৎ মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীর্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। তোর মনে আছে সে কুকীর্তিটা কী?'

রামায়ণটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ ঘটনাটা মনে ছিল। বললাম, 'অন্ধমুনির ছেলে রাত্রে নদীতে জল তুলছিল কলসীতে। দশরথ অন্ধকারে শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে। উনি শব্দভেদী বাণ মেরে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিলেন।'

'গুড। অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা ছিল দশরথের। নীহারবাবুরও ছিল।'

'নীহারবাবু!' —আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা।—'রাত জাগতে হবে বলে ঘুমের ওষুধ খান নি। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে। এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অস্ত্র—রূপো দিয়ে বাঁধানো জাঁদরেল লাঠি। খাটের কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষম ঘা। একবার নয়, তিনবার।'

'কিন্তু ... কিন্তু ...'

আমার এখনো সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এসব কী বলছে ফেলুদা? লোকটা ত অন্ধ!

'একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর?' অসহিষ্ণুভাবে বলল ফেলুদা। 'সুখওয়ানি কী বলেছে দস্তুর সম্পর্কে?'

বিদ্যুতের ঝলকের মত কথাটা মনে পড়ে গেল।—

'দস্তুরের নাক ডাকত!!'

'এগজ্যাক্টলি!' বলল ফেলুদা।—'তার মানে বালিশের কোনখানে মাথা, কোন পাশে ফিরে রয়েছে, এ সবই বুঝতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। যার শ্রবণশক্তি এত প্রখর, তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার? এক ঘায়ে যদি না হয়, তিন ঘায়ে ত হবেই!'

আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু? প্রতিশোধ?'

'প্রতিশোধ,' বলল ফেলুদা, 'জিঘাংসা। অন্ধেরও দেহমনে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিঘাংসাই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আর সেই কারণেই তিনি আইনের নাগালের বাইরে।'

আরো সতের দিন বেঁচে ছিলেন নীহাররঞ্জন দত্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র আর জমানো টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মেধাবী সেক্রেটারী রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ছবি : সত্যজিৎ রায়
[পুনর্মুদ্রিত]

প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প

সত্যজিৎ রায়

স্বপ্নদ্বীপ

২২শে মার্চ

অনেকে বলেন যে স্বপ্নে নাকি আমরা সাদা আর কালো ছাড়া অন্য কোন রং দেখি না। আমার বিশ্বাস আসল ব্যাপারটা এই যে, বেশির ভাগ সময় স্বপ্নের ঘটনাটাই কেবল আমাদের মনে থাকে; রং দেখেছি কি না দেখেছি সেটা আমরা খেয়ালই করি না। মোট কথা, কাল রাত্রে আমি এমন একটা ঝলমলে রঙীন স্বপ্ন দেখেছি যে সেটার কথা না লিখে পারছি না।

দেখলাম আমি একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে ঘরবাড়ি লোকজন কিছুই নেই—আছে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল। এই সব গাছপালার একটিও আমার চেনা নয়। এদের রংও ভারী অস্বাভাবিক। সবুজ পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে নীল লাল বেগুনী কমলা এই ধরনের রং। গাছে ফুল আর ফলও আছে—তারও একটাও আমার চেনা নয়। একটা প্রকাণ্ড ফুলে অজস্র পাপড়ি আর প্রত্যেকটা পাপড়ির রং আলাদা। আরেকটা ফুলের এক-একটা পাপড়ি যেন এক একটা হাতির কান, আর হাতির কানের মতোই সেগুলো মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। ফলও যে কত রকমের রয়েছে তার ঠিক নেই। একটা প্রকাণ্ড গাছে সরু সরু নীল রঙের ফল বটগাছের শিকড়ের মতো মাটিতে গিয়ে নেমেছে। আরেকটা তরমুজের সাইজের ফল—তার সর্বাঙ্গে গাঢ় লাল রোঁয়া, আর সেই রোঁয়ার ভিতর দুটো করে গোল গোল সাদার মাঝখানে কালো ফুটকি। ঠিক যেন মনে হয় ফলের গায়ে একজোড়া চোখ।

স্বপ্নটা এতই জলজ্যান্ত যে মনে হচ্ছিল এরকম একটা জায়গা সত্যিই আছে, আর আমি যেন সত্যিই সেখানে গেছি। আর রঙের কথাটাও ভুলতে পারছি না। স্বপ্নটা দেখা অবধি বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে ইচ্ছা করছে। বিশেষ করে এমন কোনো জায়গায় যেখানে রঙীন গাছপালা ফুল ফলের প্রাচুর্য। গিরিডিতে বছরের এই সময়টা রঙের বড় অভাব। যাক্ গে—এখন স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে আসা যাক্।

আমার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি নিয়ে গবেষণা বেশ আশাপ্রদ ভাবে এগোচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা ধাতু তৈরি করা যেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অর্থাৎ—সে-ধাতুর কোন ওজন থাকবে না। তাকে শূন্যে ছেড়ে দিলে সে শূন্যেই থেকে যাবে। এই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর সাহায্যে একটা ছোটখাটো উড়োজাহাজ তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসা যাবে।

আশ্চর্য এই যে সবচেয়ে ওজন বেশি যে ধাতুর—অর্থাৎ পারা বা Mercury—সেটি ছাড়া এই ওজনবিহীন নতুন ধাতুটি তৈরি করা যাবে না, এটা আগে বুঝতে পারিনি। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে হ্যাকেন্‌বুশের গবেষণা এই পারার অভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। পারা জোগাড় হয়েছে। তাছাড়া তামা শুঁড়ো, ষাঁড়ের খুর, চক্‌মকি পাথর ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ হয়েছে। আজ থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে পড়তে হবে। বর্ষা নামার বেশ কিছু আগেই আমার আকাশযানটি তৈরি করে ফেলতে হবে; কারণ মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করতে পারলেও, ঝড়-ঝঞ্ঝার দাপট একটা সামান্য উড়োজাহাজ সহ্য করবে কী করে?

২৫শে মার্চ

আমার তৈরি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর কী নাম দেওয়া যায় তাই ভাবছি। গবেষণা যে সফল হয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। পাঁচ বছর বয়সে প্রথম যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশ পায়, তখন থেকে আজ অবধি আমি কোনো গবেষণায় ব্যর্থ হইনি। এখনো মনে আছে আমার সেই পাঁচ বছর বয়সের ঘটনাটা। খাটে বসে আমার বন্ধু ভুতোর সঙ্গে টিড্‌লি উইংক্‌স খেলছিলাম। সে-খেলা আজকাল আর কেউ খেলে কি? সিকির সাইজের রঙ-বেরঙের সেলুলয়েডের চাকতির কিনারে আরেকটা বড় সাইজের চাকতি দিয়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেই সেগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে এগিয়ে যেতো। সামনে একটা কৌটো রাখা থাকত।

উদ্দেশ্য ছিল ছোট চাকতিগুলোকে এই ভাবে চাপ দিয়ে লাফ খাইয়ে কৌটোর মধ্যে ফেলা। সেদিন ভুতোর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ চাকতি লাফানোর বৈজ্ঞানিক কারণটা মাথায় এসে গেল, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললাম ঠিক কোনখানটায় কতখানি জোরে চাপ দিলে চাকতি বাইরে না পড়ে ঠিক কৌটোর মধ্যে গিয়ে পড়বে। তারপর থেকে আর কি ভুতো আমার সঙ্গে পারে? বাবা পাশে বসেছিলেন। আমার খেলা দেখে চোখ গোল গোল করে বললেন, 'তিলু, তোর হল কী! এ যে একেবারে ভেল্‌কি দেখিয়ে দিচ্ছিস তুই!...'

তেরো বছর বয়সে আমার মাথায় প্রথম পাকা চুল দেখা দেয়। সতেরো বছরে টাক পড়তে শুরু করে। একুশ পড়তে না পড়তে আমার মাথা-জোড়া টাক—কেবল কানের দুপাশে, ঘাড়ের কাছটায় আর ব্রহ্মতালুর জায়গায় সামান্য কয়েক গাছা পাকা চুল। অর্থাৎ আজও আমার যা চেহারা, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ছিল ঠিক তাই।

ধাতুটার নাম শ্যাঙ্কোভাইট দেওয়া স্থির করলাম। আজ আমার বেড়াল নিউটনের চার থাবায় চার টুক্‌রো শ্যাঙ্কোভাইটের পাত বেঁধে দিয়ে তাকে মাথার উপর তুলে ছেড়ে দিতেই সে বেলুনের মতো ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো। আশ্চর্য দৃশ্য এবং আশ্চর্য আনন্দ। শুধু আমার আনন্দ নয়, নিউটনেরও। মাটিতে নেমেই সে দিব্যি টেনিস বলের মতো 'হপ্' করতে করতে আমার পায়ের কাছে এসে আমার পাৎলুনে গা ঘষতে লাগল।

আমার আকাশযানের নাম দেবো শ্যাঙ্কোপ্লেন। প্লেনে একটা প্রপেলার অবশ্যই থাকবে, এবং তাতেই শূন্যে উঠে সামনের দিকে এগোনোর কাজটা হয়ে যাবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর একটু আগে হিসেব করে প্রপেলারটা থামিয়ে দিলেই প্লেন ধীরে ধীরে ঠিক জায়গায় গিয়ে নামবে।

ভালো কথা—গত তিনরাত পর পর আবার সেই রঙীন জায়গার স্বপ্ন দেখেছি। প্রতিবারই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। যেমন, সেদিন দেখলাম গাছপালা ভেদ করে পিছন দিকে সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে। একটা নামও স্বপ্নের মধ্যে কে যেন বারবার আমার কানের কাছে বলতে লাগল—'ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...'

বারবার মনে প্রশ্ন জাগছে—এমন জায়গা কি সত্যিই আছে? স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাও বলব—থাকলে বড় ভালো হত। কিন্তু কোথায়? কোন্ গ্রহে আছে এমন জায়গা? পৃথিবীতে ত এমন অদ্ভুত গাছপালার কথা কেউ জানেও না, শোনেও নি।

২৬শে মার্চ

অদ্ভুত ব্যাপার! কাল রাত্রেও সেই একই জায়গার স্বপ্ন। এবার আরো কিছু অতিরিক্ত তথ্য জানা গেল। এইসব রঙচঙে গাছপালার মধ্যে একটির গুঁড়িতে একটি গর্ত—যেমন অনেক বুড়ো বট-অশ্বত্থের গায়ে থাকে। সেই গর্ত দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর গলার স্বরে কে যেন বলে চলেছে ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান-থার্টি-সিক্স ইস্ট...ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান-থার্টি-সিক্স ইস্ট...। দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের এই হিসেবে যে জায়গাটা বেরোয় সেটা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পড়ে। ম্যাপে দেখলাম সেখানে নীল রং ছাড়া আর কিচ্ছুই নেই। অর্থাৎ ডাঙার কোন চিহ্নই নেই। এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ম্যাপে দেখানো কোনো জায়গায় এসব গাছপালা থাকতেই পারে না।

পাঁচদিন পর পর একই স্বপ্ন দেখার ফলে জায়গাটাতে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটা সম্ভবত-কাল্পনিক জায়গার প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ মোটেই বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ নয় সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু কী আর করি? ডায়রিতে ত মনের আসল ভাবটা প্রকাশ করতে হয়!

আজ আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। শ্যাঙ্কোভাইট নিয়ে অবিনাশবাবুকে একটু চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। পাশেই টেবিলের উপর থেকে একটা টুক্‌রো নিয়ে ভদ্রলোকের নাকের সামনে শূন্যে ছেড়ে দিতে সেটা সেখানেই রয়ে গেল।

ভদ্রলোক মিনিট খানেক সেটার দিকে চেয়ে থেকে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বললেন, 'দিব্যি উড়ে রয়েছে, অথচ ডানার ভন্‌ভনানি ত শুনতে পাচ্ছি না! কী পোকা মশাই?'

ভদ্রলোক আমার এত পরিশ্রমের এত সাধের আবিষ্কারটিকে এক কথায় পোকার পর্যায়ে ফেলে দেবেন তা ভাবতে পারিনি। অবশ্য ওঁর মতো অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক এবার শূন্যে ভাসমান চাকতিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আজকের কাগজে খবর দেখেছেন?'

'কী খবর?'—আমি যখন গবেষণায় ব্যস্ত থাকি তখন অনেক সময় খবরের কাগজ দেখার

আর সুযোগ হয় না। অবিনাশবাবু পকেটে হাত দিয়ে একটা বাংলা কাগজের ছেঁড়া অংশ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খবরটা পড়ে আমি রীতিমত বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলাম।

ইউরোপের সাতজন স্বনামধন্য মনীষী একজোটে উধাও হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর সিডনি হ্যামলিন ও জাপানের দার্শনিক হামুচি হামাদাকে আমি চিনি। অন্য পাঁচজন হচ্ছেন ইতালীর গণিত বিশারদ উমবের্তো কারবোনি, জার্মানির বায়োকেমিস্ট ডক্টর আডল্‌ফ ব্রোডেন, সুইডেনের ভূতত্ত্ববিদ্ ওলসেন বোর্গ, ফ্রান্সের মনস্তত্ত্ববিদ্ আঁরি ভিল্‌মো আর রুশ ভাষাবিদ্ ভ্লাদিমির তুশেঙ্কো। এঁরা সকলেই ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে একটা আন্তর্জাতিক মনীষী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। আমারও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু শ্যাঙ্কোভাইটের কাজটা ফেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সাতজনেই একদিনে একই সময়ে অদৃশ্য হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে ম্যানিলার সমুদ্রতীর থেকে একটা স্টিম লঞ্চও অদৃশ্য হয়েছে। খবরে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে এইসব মনীষীদের হয়তো কোনো দুর্বৃত্তের দল কোনো অজ্ঞাত কারণে 'কিডন্যাপ' করেছে।

খবরটা মোটেই ভাল নয়। অবিনাশবাবু বললেন, 'কদ্দিন বলিচি বাড়ির বাইরে একটা পাহারার বন্দোবস্ত করুন। নিমু হালদারকে বললেই বারো মাসের জন্য একটা পুলিস মোতায়েন করে দেবেন ফটকের সামনে। অতিসাহস মূর্খের লক্ষণ—এ প্রবাদটা বোধহয় জানা নেই আপনার...'

আমি অবিশ্যি আশাবাদী মানুষ ; কিংবা স্বপ্ন আর শ্যাঙ্কোভাইট মিলিয়ে আমার মনের অবস্থাটা হয়ত একটু অতিমাত্রায় হাল্‌কা ছিল, তাই বললুম, 'ওসব কিডন্যাপিং-ট্যাপিং সব রং চড়ানো গল্প। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেরা নিজেরাই উদ্যোগ করে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছেন—দু' একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে একটা খচ্‌খচানি রয়ে গেল। শ্যাঙ্কোপ্লেনের জন্য যোগাড়যন্ত্র করতে করতে বার বার হ্যামলিন ও হামাদার কথা মনে পড়ছিল।

২রা এপ্রিল

পরশু সকালে আমরা গিরিডি থেকে রওনা হয়েছি। 'আমরা' বলছি কারণ অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পর ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাবোধও রয়েছে ; তাই তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করে পারলাম না। বললেন, 'এমনিতে এরোপ্লেন চড়ার কোনো সখ নেই আমার, তবে আপনি যখন বলছেন যে আপনার এ-যন্ত্রটি ক্র্যাশ করবে না, তখন যেখানেই যেতে চান চলুন, আমি সঙ্গে আছি। তবে কোথায় যাচ্ছেন সেটাও ত একবার জানা দরকার। তিব্বত-টিব্বত নাকি?'

আমি একটু রসিকতা করেই বললাম, 'ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ—লঙ্গিচিউড ওয়ান-থার্টি সিক্স ইস্ট।'

তাতে ভদ্রলোক বললেন, 'ওসব ল্যাটাচি-লঙাচি রাখুন মশাই—আপনার ব্যাঙাচির মধ্যে আমার অ্যাটাচির জায়গাটা হবে কিনা সেইটে বলুন। আপনার মতো এক কাপড়ে বেশিদিন চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

আমার প্লেনের সাইজ লম্বায় সাড়ে আট ফুট আর চওড়ায় তিন ফুট। লেজ আছে ডানা নেই। ওঠা-নামার জন্য দুদিকে দুটো কান্‌কোর মতো জিনিস আছে। প্রপেলার অবশ্যই আছে, আর মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য ব্যবস্থা আছে। বসার আসন হবে বলে আমার বাড়িরই দুটো পুরোন কৌচের মখমলের সীট খুলে প্লেনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। প্লেনের অবস্থান উচ্চতা গতিবেগ ইত্যাদি নির্ণয় করার জন্যেও যন্ত্রপাতি অবশ্যই আছে।

খাওয়ার ব্যাপারটা সহজ করে নিয়েছি। দুটো বৈয়ামে দু'মাসের মতো 'বটিকা ইন্ডিকা' নিয়েছি—এক বড়িতেই সারাদিনের জন্য পেট ভরে যাবে। তেষ্টা মেটানোর জন্য 'তৃষ্ণাশক' বড়ি আছে, আর আছে টি-পিল্‌স আর কফি-পিল্‌স। আমার জন্য শুধু কফি-পিল্‌স হলেই চলত, কিন্তু অবিনাশবাবুর আবার দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। এ ছাড়া আর যে ক'টা জিনিস আছে, সেগুলো বাইরে গেলেই আমি সঙ্গে নিই—আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল, আমার অম্‌নিস্কোপ, আমার ছবি তোলার ক্যামেরাপিড যন্ত্র। প্রপেলার এঞ্জিনের জন্য রসদ হিসেবে নিয়েছি দু টিন টার্বোলিন। তার মানে পঞ্চাশ হাজার মাইলের জন্য নিশ্চিন্ত। আমার তৈরি এই তেলের গন্ধ ঠিক চন্দন কাঠের মতো। অর্থাৎ আমার সঙ্গে যা কিছু নিয়েছি তা সবই আমারই গবেষণাগারে তৈরি—এভরিথিং মেড বাই শঙ্কু—এক আমার সহযাত্রী অবিনাশ

মজুমদার ছাড়া।

প্লেনের গতি এখন ২০০ মাইল পার আওয়ার, উচ্চতা ২৫০০ ফুট। এই দুদিনে আমরা প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল এসেছি। যে রাস্তায় যাবো ঠিক করেছিলাম, সেই রাস্তাতেই চলেছি। বঙ্গোপসাগরে পড়ে পুব-দক্ষিণে চলেছি সুমাত্রার দিকে। সুমাত্রা পৌঁছে সেখান থেকে পুবে ঘুরে বোর্নিওর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ব প্রশান্ত মহাসাগরে। তারপর ডাঙা এড়িয়ে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে উত্তর-পুবে আমাদের লক্ষ্যস্থল ল্যাটিচিউড ষোল নর্থ ও লঙ্গিচিউড একশো ছত্রিশ ইস্টের দিকে ধাওয়া করব। যদি আকাশ থেকে বুঝি সেখানে কিছু আছে, তবে সেখানে গিয়েই নামব ; না থাকলে উল্টোপথে ঘুরে এসে দু-একটা মনোরম জায়গা বেছে নিয়ে দু-একদিন করে থেকে হাওয়া বদল করে আবার দেশে ফিরে আসব।

এই কিছুক্ষণ আগে আমরা নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ পেরোলাম। নিকোবারের উপর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আর কিছুটা কৌতূহলবশত প্লেনটাকে একটু বেশি নিচে নামিয়ে ফেলেছিলাম। নারকেল গাছের পাতাগুলো প্রায় ছোঁয়া যায় বলে মনে হচ্ছিল। এমন সময় অবিনাশবাবু হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন। ফিরে দেখি তাঁর হাতের আস্তিনের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় পৎ পৎ করছে, আর মুখটা হয়ে গেছে কাগজের মতো ফ্যাকাসে। কী ব্যাপার।

অবিনাশবাবু ঘাড় কাৎ করে নিচের দিকে ইঙ্গিত করলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনটে তীর সাঁই সাঁই করে আমার প্লেনের পাশ দিয়ে চলে গেল আকাশের দিকে।

বোতাম টিপে তৎক্ষণাৎ প্লেনটাকে উপর দিকে ওঠাতে ওঠাতে দেখলাম নিচে এক পাল কালো বেঁটে লোক, তাদের হাতে তীর ধনুক, গায়ে উল্‌কি, কানে মাক্‌ড়ি আর পরনে কিছু নেই বললেই চলে। তিনশো ফুট উপরে উঠে তবে নিকোবারের বন্য আদিবাসীদের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

এ ছাড়া আরো একটা ঘটনা ঘটেছে আরো আগে—সেটার কথাও এই ফাঁকে বলে রাখি।

কলকাতার দক্ষিণে পোর্টক্যানিং পেরোবার কিছু পরেই এক পাল শকুনি আমাদের সঙ্গ নিল। তখন আমরা আছি প্রায় পাঁচশো ফুট হাইটে। ইচ্ছে করলেই স্পীড বা হাইট বাড়িয়ে শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করতে পারতাম, এবং অবিনাশবাবুরও ইচ্ছা ছিল সেটাই, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল শকুনিগুলো কোথায় গিয়ে নামে সেটা দেখব।

সুন্দরবনের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সব ক'টা শকুনি হঠাৎ একসঙ্গে নিচের দিকে গোঁৎ খেলো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাকে নিচে নামাতে শুরু করলাম। পাঁচশো ফুট থেকে ক্রমে চারশো তিনশো দুশো করে নেমে শেষে এমন হাইটে পৌঁছলাম যেখানে গাছের পাতার মধ্যে পাখির বাসায় ডিম পর্যন্ত দেখা যায়।

শকুনিগুলো চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বনের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে নামল। প্লেনের প্রপেলার বন্ধ করে ভাসতে ভাসতে নিচের দিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নেমে বুঝলাম কিসের লোভে শকুনিরা এখানে নেমেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটি বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাশেই বোধহয় কোন গ্রাম থেকে একটা আস্ত গরুকে ঘায়েল করে টেনে নিয়ে এসেছে নিরিবিলিতে তাকে ভক্ষণ করবে বলে।

অবিনাশবাবু আমার কোটের কলারটা পিছন দিক থেকে খামচে ধরলেন। বাঘটাও দেখলাম আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে একদৃষ্টে আমাদের প্লেনটাকে দেখতে লাগল। শকুনিগুলো আশেপাশের গাছের মগডালে গিয়ে বসেছে—বাঘ যদি কিছু অবশিষ্ট রাখে তাই দিয়েই হবে তাদের ভোজ।

আমার প্লেন এখন চল্লিশ ফুট হাইটে। সামনে একশো হাতের মধ্যে বাঘ। এবার প্লেনের শব্দ ছাপিয়ে তার গর্জন শুনতে পেলাম।

আমি আর অপেক্ষা না করেই পকেট থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে বাঘের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিলাম। পরমুহূর্তেই দেখা গেল যেখানে বাঘ ছিল সেখানে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি, আর তার পরে তাও নেই।

এখন আমরা যেখান দিয়ে উড়ছি তার চারদিকে—এই আড়াই হাজার ফুট থেকেও—যতদূর চোখ যায়, জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

চমৎকার উড়ছে আমার শ্যাঙ্কোপ্লেন। ঝাঁকানি নেই একটুও, তাই লিখতে কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। প্রপেলারের আওয়াজের জন্যই বোধহয় অবিনাশবাবুর কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে তাঁর খুব একটা আপশোষ হচ্ছে বলে মনে হয় না। গিরিডিতে ভদ্রলোক এক মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। এখানে বাধ্য হয়ে মৌনতা অবলম্বন করেও দেখছি

তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগেই আছে। বার দুয়েক ভদ্রলোককে ঘুমিয়েও পড়তে দেখেছি, তবে কোনবারই বেশিক্ষণের জন্য নয়।

সত্যি বলতে কি, আমার একটা কথা শুনেই বোধহয় ভদ্রলোক ঘুমের মাত্রাটা কমিয়ে দিয়েছেন। পরশু সকালে প্লেনে ওঠার কিছুক্ষণ আগে কথাচ্ছলে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন যে একজন সাধারণ মানুষ তার জীবনের তিন ভাগের একভাগ ঘুমিয়ে কাটায়?'

ভদ্রলোক আমার কোনো কথা অবিশ্বাস করলেই খিক্ খিক্ করে হেসে এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে থাকেন। এখনও সেটাই করে বললেন, 'মশাই, এসব ছেলে-ভুলোন আজগুবি কথা আপনি আপনার চাকর পেল্লাদকে বলুন, আমাকে বলবেন না।' কী মুস্কিল! আমি বললাম, 'আপনি রাত্রে কখন ঘুমোন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই ধরুন দশটা সাড়ে দশটা।'

'আর ওঠেন?'

'ঘড়ি ধরে ছ'টা।'

'তার মানে ক'ঘণ্টা ঘুমোন হল?'

'এই সেরেছে—হিসেব করতে হবে?' বলে অবিনাশবাবু ভুরু কুঁচকে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'প্রায় আট ঘণ্টা।'

'ক'ঘণ্টায় একদিন হয়?'

'আবার প্রশ্ন? দাঁড়ান—চব্বিশ ত। চব্বিশ না?'

'চব্বিশ। তিন আষ্টে চব্বিশ। তার মানে একদিনের তিনভাগের একভাগ সময় আপনি ঘুমোন—তাই ত?'

ভদ্রলোক এবার যেন এক পলক হিসাবটা বুঝে নিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'সময়ের কী ওয়েস্ট বলুন ত! তিনভাগের এক ভাগ জীবন স্রেফ ঘুমিয়ে নষ্ট করা!'

আসলে ঘুমের প্রসঙ্গ তুলে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা এই—আমি নিজে যেটুকু সামান্য সময় প্লেনে ঘুমিয়েছি, তার মধ্যেও আমার দ্বীপের স্বপ্ন দেখেছি—ফ্লোরেনা দ্বীপ—যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল বিচিত্ররকমের না-দেখা না-জানা গাছপালা আর ফুলফল।

৪ঠা এপ্রিল

কাল বিকেলে আমরা বোর্নিও ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছি। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে প্লেন নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলাম। অবিনাশবাবু নামবার মিনিট খানেকের মধ্যেই হাতের কাছে একটা কলাগাছ থেকে একছড়া কলা ছিঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে একটা খোসা ছাড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন।

সুমাত্রার ঠিক মাঝখান দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে। এখানকার গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের আশ্চর্য মিল। কাছেই জঙ্গলের মধ্যে পেঁপে, বাঁশ, নারকেল ইত্যাদি চোখে পড়ছে। এতদূর পথ এসে দেশের সঙ্গে এত মিল পাওয়ায় ভারী অদ্ভুত লাগছিল।

অবিনাশবাবু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কলা খেতে খেতে গাছপালার পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা বিকট শব্দ বেরোল। চেয়ে দেখি ভদ্রলোকের হাত থেকে কলার ছড়া মাটিতে পড়ে গেছে, তিনি হাত দুটোকে পিছিয়ে নিয়ে ঘাড় গোঁজ করে চোখ বড় বড় করে একটা গাছের দিকে চেয়ে আছেন। কী দেখলেন ভদ্রলোক?

আমি ব্যস্তভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর সামনের গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'ওটা আবার কী মশাই?'

যা দেখলাম তাতে আমি যেমনি অবাক তেমনি খুশি। গাছের নিচের দিকের একটা ডালে বসে আছে একটা প্রাণী, সেটা জাতে বাঁদর হলেও সেরকম বাঁদর সচরাচর দেখা যায় না। এ বাঁদর সুমাত্রার অধিবাসী। সাইজে একটা বেড়ালের বাচ্চার মতো—চোখ দুটো মুখের অনুপাতে আশ্চর্য রকম বড়, হাত পা সরু সরু, আর সেগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করে তাতে মনে হয় বাঁদরটা হয় ভারী নিস্তেজ, না হয় অত্যন্ত কুঁড়ে। আসলে কিন্তু এ-বাঁদর স্বাভাবতই ওরকম ঢিমে, আর তাই এর নাম হল 'স্লো লরিস'।

অবিনাশবাবুর অবাক ভাব এখনো কাটেনি। আমি বাঁদরটার কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই

সেটা ডাল থেকে আমার হাতের কব্জির উপর চলে এলো। অবিশ্যি এই সামান্য ঘটনাটা ঘটতে লাগল প্রায় দু' মিনিট। স্থির করলাম যে এই নিরীহ খুদে জানোয়ারটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে নেবো। নিউটনের একটা খেলার সাথী হবে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ওর নাম দিন টিমু।'

টিমু এখন আমারই পাশে চুপচাপ বসে আছে। একবার দুহাত দিয়ে প্লেনের দরজাটা ধরে অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করেছিল। তারপর ঠিক সেইরকমই ধীরে মাথাটাকে নামিয়ে নিয়ে আমার কোলের উপর রেখে চুপচাপ পড়ে আছে।

৫ই এপ্রিল, সকাল আটটা

Long 136 E—Lat 16 N। দেড়শ মাইল দূর এবং দু হাজার ফুট হাইট থেকে এইমাত্র যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম সেটার কথা লিখে রাখি।

দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে একটা রামধনুর টুকরোর মতো দ্বীপ। অম্‌নিস্কোপ দিয়ে দেখে বুঝেছি এটাই আমার স্বপ্নে দেখা দ্বীপ। রংগুলো গাছপালার রং, তবে সেটা যে দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা নয়। সামনের দিকে—অর্থাৎ আমাদের দিকে—রং কিছুটা কম, পিছন দিকটায় বেশি।

অম্‌নিস্কোপ এখন অবিনাশবাবুর হাতে। তাঁকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলিনি। তিনি দৃশ্য দেখে আহা উহু করছেন। বললেন, 'চলুন মশাই—ওইখানেই নামা যাক্। ভারী মনোরম জায়গা বলে মনে হচ্ছে।'

আমার মন বিস্ময়ে ভরে উঠেছে। স্বপ্নও তাহলে সত্যি হয়! আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছে যাবো। টিমু দিব্যি আছে।

৫ই এপ্রিল, সকাল সাড়ে নটা

আমরা দশ মিনিট হল ল্যান্ড করেছি। এমন একটা অদ্ভুত জায়গাও তাহলে পৃথিবীতে থাকতে পারে। গাছপালা যে অদ্ভুত হবে সেটা ত আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এসে দেখছি এর মাটিও অন্যরকম। মাটি বলতে আমরা যা বুঝি এটা তা নয়। এমনকি এটা বালিও নয়। বালির চেয়ে অন্তত চারগুণ বড় লাল আর নীল রঙের দানার সমষ্টি এই মাটি। দূর থেকে লাল ও নীল একাকার হয়ে বেগুনিতে পরিণত হয়; হাতে তুললে তবে বোঝা যায় দানাগুলো আসলে দু'রকম রঙের। দানার ওজন অসম্ভব রকম ভারী। একমুঠো হাতে নিয়ে মিনিট খানেকের বেশি রাখা যায় না—হাত টন্ টন্ করে।

আসল দেখবার জিনিস অবিশ্যি গাছপালা। দ্বীপের এদিকের গাছের রং দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছি। স্বপ্নে-দেখা রঙের জেল্লা এতে নেই। সব রঙের মধ্যেই যেন একটা কালোর ছোপ পড়েছে, ডালপালা কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে, গাছ নুইয়ে পড়েছে, ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এগুলো সব জীবন্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তবে আমি জানি দ্বীপের অন্য দিকটায় রঙের ছড়াছড়ি। এদিকে অবাক হতে হয় রং দেখে নয়, ফুল ফল পাতার সাইজ দেখে। একটু বিশ্রাম করে আমরা উল্টোদিকটায় যাবো।

শ্যাঙ্কোপ্লেনটা আমাদের হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চমৎকার কাজ দিয়েছে আমার নিজের হাতে তৈরি এই আকাশযানটি। টিমু চুপচাপ মাটিতে বসে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নীল-লাল দানাগুলো নাড়াচাড়া করছে। হাফ প্যান্ট পরা অবিনাশবাবু সমুদ্রের জলে হাতমুখ ধুয়ে কুলকুচি করে আমার কাছে এসে বনের দিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'যাবার সময় সঙ্গে কিছু চারা নিয়ে যাবেন। আপনার বাগানে দু'একটা এরকম গাছ গজাতে পারলে বাহার হবে।'

ভদ্রলোক ফ্লোরোনার অনন্যসাধারণ বিশেষত্বটা বোধহয় বুঝে উঠতে পারেননি, তাই ওঁর মনে বিস্ময়ের ভাব জাগছে না। টিমুর চালচলন লক্ষ্য করছি আগের চেয়ে যেন একটু বেশি দ্রুত। হয়ত তার মনেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তার গোল গোল চোখে সেটা নতুন করে প্রকাশ পাবার কোনো উপায় নেই।

এইমাত্র একটা ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এলো। ঠিক যেন কেউ হাসছে। বোধহয় কোনো পাখিটাখি হবে, যদিও এসে অবধি একটি প্রাণীও চোখে পড়েনি। মাটিতে কোনো পোকামাকড় পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না, জীবজন্তু ত দূরের কথা। এদিক দিয়ে জায়গাটাকে ভারী নিরাপদ বলে মনে হয়। তাই বোধহয় মনটা কি রকম হাল্‌কা হয়ে গেছে। মাথাটাও হাল্‌কা লাগছে। আমার গিরিডির গবেষণাগারে, আমার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সমস্যা, অঙ্কের

হিসাব আর ফরমুলা—সবই যেন অন্য জগতের অন্য আরেক যুগের জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

এদিকটায় এসেছি। বড় অলস লাগছে। চারিদিকে রং। স্বপ্নের সব কিছু এখানে। আরেক অদ্ভুত ঘটনা। সেই হারান সাতজন সবাই এখানে। কী হয়েছে তাঁদের জানি না। সবাই বসে আছেন হাত পা ছড়িয়ে। সবাই যেন খোকা। সবাই যেন বোকা। খালি হা হা করে হাসেন। আর কি লিখি। আর কিছুই নেই লেখার। আমায় ডাকছে বোধহয়। হ্যাঁ, আমায় ডাকছে, যাই আমি।

অবিনাশবাবুর কথা

আমি শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছি। খাতা শঙ্কু মহাশয়ের। আজ তারিখ ৫ই এপ্রিল, সময় রাত আড়াইটা। লিখিয়া অভ্যাস নাই। একমাত্র চিঠিপত্র ব্যতীত বহুকাল যাবৎ আর কিছু লিখি নাই। বাল্যকালে ইস্কুলে একবার প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষকের বাহবা পাইয়াছিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতেছি। আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। আমারও যদি কিছু হয়, এই খাতা যে ব্যক্তির হস্তে পড়িবে, তিনি এক অবিস্মরণীয়, আতঙ্কজনক অলৌকিক ঘটনার বিষয় অবগত হইবেন। আমার পশ্চাতে বিশ হাত দূরে বন। বনের বৃক্ষাদি হইতে যে রঙীন আলোক নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই আলোতেই লিখিতেছি। অন্য কোনো আলো নাই, কারণ আকাশ মেঘশূন্য হইলেও আজ অমাবস্যা।

এই দ্বীপে পঁহুছিয়া পূর্ব উপকূলে আধঘণ্টা কাল অবস্থানের পর শঙ্কু প্রস্তাব করিলেন যে, দ্বীপের অন্যত্র কী আছে বা না আছে তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত। আকাশ হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে দ্বীপটি বৃত্তাকার, এবং এই বৃত্তের ডায়ামিটার দুই মাইলের অধিক নহে।

আমরা স্থির করিলাম অনুসন্ধান পদব্রজে না করিয়া আকাশযানের সাহায্যেই করা হইবে। অতএব বৃথা কালক্ষয় না করিয়া টিমু-বানরকে সঙ্গে লইয়া আমরা রওয়ানা দিলাম।

ভূমি হইতে পঞ্চাশ ফুট উর্ধ্বে থাকিয়া দশ মাইল বেগে আমরা পশ্চিম উপকূলের উদ্দেশে উড়িয়া চলিলাম।

এক মাইল পথ এইভাবে চলিবার পর আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছি, নিম্নের বৃক্ষের বর্ণশোভা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সতেরো মিনিটকাল এইভাবে উড়িবার পর শঙ্কু মহাশয়ের আকাশযানটি পুনরায় স্পর্শ করিল।

যান হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র একটা আশ্চর্য জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাহার জানি একজোড়া সোনার চশমা মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার লেন্‌সদ্বয় অপরাহ্ণের সূর্যালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। শঙ্কুমহাশয় একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চশমাটি হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যামলিন।' অতঃপর আমরা হাঁটিয়া (টিমু আমার স্কন্ধে) আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরো কিছু আশ্চর্য জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমে একটা ধূসরবর্ণ ফেল্ট-টুপি, তারপর একটা ওয়াকিং স্টিক, তারপর একটা সবুজ রঙের রেশমের রুমাল, তারপর বাঁকানো পাইপ, এবং সর্বশেষে এইসমস্ত কিছুর পর একটা আস্ত মানুষ।

ইনি সম্ভবত জাপানী অথবা চীনদেশীয়। পরনে গাঢ় নীল রঙের সুট। দুইটি সুজুতার একটি হাতে লইয়া হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ্য করিলাম ভদ্রলোকের তিনটি দাঁত সোনা দিয়া বাঁধানো। শঙ্কু মহাশয় ভদ্রলোককে দেখিয়া 'হামাদা' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন। উক্ত শব্দের অর্থ আমার বোধগম্য হইল না। জাপানী (বা চীন) ভদ্রলোকটি কোনো কথাই কহিলেন না। কেবল সেই একই ভাবে দন্ত বিকশিত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

শঙ্কু মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, 'কি বুঝিতেছেন?' তিনি আমার প্রশ্নে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখি তিনি যেন আনন্দে বিহ্বল। দুইবার লাফাইলেন। দুইবার হাততালি দিলেন। তৎপরে পুনরায় হাঁটিতে লাগিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা আরো ছয়জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। ছয়জনই বিদেশীয়। অর্থাৎ ইউরোপবাসী। একজন তাঁহার মনিব্যাগ হইতে এক একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া ব্যাঙবাজি খেলার ভঙ্গিতে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আরেকজন অদম্য উৎসাহে ডিগবাজি খাইতেছেন, আরেকজন জাঙ্গিয়া পরিয়া দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গিতে উত্তোলন করিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাহিতেছেন, আরেকজন একটি ইংরাজি ছেলে-ভুলানো ছড়া—

যাহার প্রথম পংক্তি 'বা বা ব্ল্যাকশীপ'—সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে শঙ্কু মহাশয় 'হ্যামলিন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইবামাত্র ভদ্রলোক ব্ল্যাকশীপ ছাড়িয়া 'জ্যাকাঞ্জিল' ছড়াটি আবৃত্তি করিলেন।

অবশিষ্ট দুইজনকে দেখিতে পাইলাম বৃক্ষতলে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত অবস্থায়। ইহার পরে শঙ্কু মহাশয় তাঁহার কোটের পকেট হইতে তাঁহার লাল ডায়রি খাতাটি বাহির করিয়া সমুদ্রতটে

বসিয়া কী যেন লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সবের অর্থ কি? ইহারা কাহারা? হ্যামলিন কে? হামাদা কী? ইহারা সকলেই ভদ্র এবং প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে কেন? সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া আমি সবিশেষ চিন্তিত ও বিমূঢ়, কিন্তু আপনাকে এত নিশ্চিন্ত দেখিতেছি কেন?' বলা বাহুল্য আমরা কোনো প্রশ্নেরই কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শঙ্কু মহাশয়ও দেখিলাম অধিক লিখিতে পারিলেন না। খাতা ও ফাউন্টেন পেন তাঁহার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল, তিনি নির্বাক হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার পকেট-ওয়াচে দেখি ছটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এতক্ষণ সময় কাটিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেই পারি না। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই অস্তমিত হইবে। সমুদ্র প্রায় নিস্তরঙ্গ, সুতরাং জলের শব্দ নাই বলিলেই চলে। পক্ষীর কাকলিও নাই, কারণ পক্ষীই নাই। ঢিমু ব্যতীত অন্য কোনো পশুও নাই ; মশার শব্দ, তক্ষকের ডাক, শৃগালের চীৎকার, ভেকের কলরব, ঝিঁঝির ঐক্যতান কিছুই নাই। চারিদিকে অপার্থিব আদিম নিস্তব্ধতা।

গাছপালার দিকে দৃষ্টি গেল। পত্র-পুষ্প-ফলে প্রতিটি গাছ টৈটম্বুর, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্পন্দনের আভাস নাই। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে কিসের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আরো একটি আশ্চর্য এই যে, ফুল-ফলের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও কোনো প্রকার গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিতেছে না, না দুর্গন্ধ না সুগন্ধ।

আমি অবাক হইয়া চারিদিকের অপূর্ব বন্য শোভা লক্ষ করিতেছি, এমন সময় সহসা আলোক হ্রাস পাওয়াতে বুঝিলাম সূর্য অস্ত গেল। পরমুহূর্তেই অনুভব করিলাম সমুদ্রের দিক হইতে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া বনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। ঢিমু-বানর আমা হইতে কিয়দ্দূরে বসিয়াছিল ; এক্ষণে সে ধীর পদক্ষেপে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া আমার স্কন্ধে স্থাপন করাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। ঢিমু কি ভয় পাইয়াছে? জানি না। ঈশ্বর করুন, নিরীহ বানরের যেন কোনরূপ অনিষ্ট না হয়।

এ কিসের শব্দ? সহসা চারিদিক হইতে সম্মিলিত সংগীতের মতো মিহি মোলায়েম স্বর উত্থিত হইতেছে।

হু হু হু হু রি রি রি রি করিয়া এই স্বর ক্রমে তীব্রতর হইয়া তারসপ্তকে উঠিল। আমি দুরু দুরু বক্ষে বনের দিকে চাহিতেই এক অদ্ভুত অভাবনীয় নতুন কাণ্ডের সূচনা লক্ষ্য করিলাম। বনের প্রতিটি বৃক্ষ যেন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি পত্র, প্রতিটি ফুল ও ফল যেন সজীব ও অস্থির হইয়া বৃক্ষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেন আলোক বৃদ্ধি পাইতেছে।

শঙ্কু মহাশয় কি এ দৃশ্য দেখিতেছেন?

অনুসন্ধানে বুঝিলাম তিনি স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন অথবা করিতে চলিয়াছেন। শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া তিনি একটি বিশেষ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই বৃক্ষটি অন্যগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, কারণ ইহার ফুলের রং বাদামী । এক একটি ফুল এক একটি বাঁধাকপির ন্যায় বৃহৎ। শঙ্কু মহাশয় বৃক্ষটির পাদদেশে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অবাক হইয়া দেখিলাম, বৃক্ষস্থিত বৃহদাকার ফলগুলি যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিবার জন্য তাঁহারই দিকে নত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি আমার মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার হইল। শঙ্কু মহাশয় যখন বৃক্ষমূল হইতে সামান্য দূরে, তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক লম্ফে বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ফুলটির নিম্নগতি রোধ করিবার জন্য আমার দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিলাম। পরমুহূর্তে ফুলটি এক আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া বসিল, যাহার কথা ভাবিলে এখনো আমার সমস্ত দেহ হিম হইয়া আসে। ফুল যে সর্পের ন্যায় ছোবল মারিতে জানে ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এক্ষণে বুঝিলাম আমার জ্ঞান কত সীমিত। সেই প্রকাণ্ড ফুলের ছোবলে প্রথমত ঢিমু আমার স্কন্ধ হইতে ছিট্‌কাইয়া দশ হাত দূরে পড়িল। তাহার পর আমিও ধরাশায়ী হইলাম। পতনের সময় ফুলটিকে জাপটাইয়া ধরার ফলে আমার হস্তে তাহার একটি স্তবকের একটি সামান্য ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল।

আর শঙ্কু মহাশয়? তিনি নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হামাগুড়ি দিয়া বৃক্ষটির পাদদেশে পৌঁছিলেন, এবং ফুলটি নামিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিল। ইহার পর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখিলাম ফুলের স্তবকগুলি শঙ্কু মহাশয়ের মস্তকের চতুর্দিক বেষ্টন করিতেছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ফুলটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া গেল। এক্ষণে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম ফুলের বাদামী রং মুহূর্ত মধ্যে হলুদে পরিণত হইল। এই হলুদে কমলার ছোপ। এই হলুদ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল, এবং সমগ্র বৃক্ষটিতে আন্দোলনের সঞ্চার হওয়ার ফলে এই হলুদকে লেলিহান অগ্নিশিখার মতই প্রতীয়মান হইল।

শঙ্কু মহাশয়কে দেখিলাম তিনি অন্য একটি বৃক্ষের দিকে হামাগুড়ি দিতেছেন।

আমি আর দেখিতে পারিলাম না। প্রায় দশ মিনিট কাল এইভাবে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া অবশেষে শঙ্কু মহাশয় পুনরায় আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, যদিও তিনি আমার নৈকট্য সম্পর্কে আদৌ সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। অর্ধনিমীলিত নেত্রে দুই বাহু উত্তোলন করিয়া হাসি হাসি মুখে তিনি কেবল দুইটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—'টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস।'

প্রায় ত্রিশবার একইভাবে গদগদ কণ্ঠে উক্ত অর্থহীন শব্দটি উচ্চারণ করিয়া শঙ্কু মহাশয় ভূমিতে গাত্র এলাইয়া দিয়া হয় অচেতন না হয় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বনে এখন উন্মাদনা। ফল-ফুলের সূতীক্ষ্ণ বর্ণচ্ছটায় আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছে, তাহাদের সমবেত রী রী রী রী রী সংগীতে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম, তাহাদের তাণ্ডবলীলায় বক্ষে কণ্ঠরোধকারী ত্রাসের সঞ্চার। এ কি স্বপ্ন না সত্যি? আমার স্কন্ধে টিমু-বানর এখনো সজাগ। তাহার আচরণে কোনরূপ পরিবর্তন নাই। দুই হাতে এখনো সে আমার গলা বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে পরিপার্শ্বের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইতেছে।

আমি বনের পার্শ্ব হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলাম। জাপানী ও বিদেশীয় যে সাতজনকে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের পুনরায় দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই এখন নিদ্রিত—হাত পা ছড়াইয়া অসহায়ভাবে সমুদ্রতটে শায়িত। একমাত্র আমারই চক্ষু হইতে নিদ্রা বিতাড়িত। মনে মনে বলিলাম, শঙ্কু মহাশয়ের সহিত একত্রে দেশভ্রমণের বাসনা বোধহয় চিরকালের জন্য মিটিল।

টিমুকে লইয়া একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলাম। বিমানপোতটি যেমন রাখা ছিল তেমনি রহিয়াছে। সমুদ্রের জল তাহার দুই হাতের মধ্যে আসিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পড়িতেছে। সামান্য তরঙ্গের আভাস দেখা যায় যেন জলের মধ্যে।

একমাত্র আমাদের দ্বীপ ব্যতীত আর সর্বত্রই প্রগাঢ় অন্ধকার। সমুদ্র কোথায় গিয়া আকাশের সঙ্গে মিলিয়াছে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মধ্য দিয়া ছায়াপথ চলিয়া গিয়াছে। একটি উল্কাপাতও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্তের জন্য মনে হইল আমি এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছি ; প্রকৃতপক্ষে আমি গিরিডিতেই আছি, নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইব আমার পরিচিত অভ্যস্ত দৈনন্দিন জগতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সাময়িক ভ্রান্তি দূর হইল, এবং আমি পুনরায় বিষাদ ও আতঙ্কে নিমজ্জিত হইলাম। অতঃপর স্থির করিলাম শঙ্কু মহাশয়ের খাতায় আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। শঙ্কু মহাশয়কে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার আর কোনদিন লেখনী ধারণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এ কী? সহসা একটা আন্দোলন অনুভব করিতেছি কেন? সমগ্র দ্বীপটাই যে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমিকম্প নাকি? জলরেখা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন? আমাদের আকাশযান ক্রমশ ভাসিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে কেন? চারিপার্শ্ব হইতে হাহাকার উত্থিত হইতেছে কেন?

এ কী—আমার হাফপ্যান্টের পশ্চাৎদেশে একটা আর্দ্র শীতলতা অনুভব করিতেছি কেন? শেষ পর্যন্ত কি আমার অদৃষ্টে সলিলসমাধি রহিয়াছে?

এখন আমার কোমর অবধি জল, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় লিখিতেছি। টিমু আমার স্কন্ধে কম্পমান। দূরে সমুদ্রবক্ষে একটি আলোকবিন্দু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে আমাদের দিকে। আর লেখা অসম্ভব। হে ঈশ্বর—

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি। গিরিডি, ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা।

আমি আজ আবার লিখতে পারছি। এই তিন মাসে আমার হারানো বুদ্ধি ও জ্ঞানের

অনেকটাই ফিরে পেয়েছি। আমি যে ঊনসত্তরটা ভাষা জানতাম, তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা এর মধ্যেই আবার বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। বাকি ক'টা নতুন করে শিখে নিতে আরো মাস দুয়েক লাগবে বলে মনে হয়।

কাল হ্যামলিনের একটা চিঠি পেয়েছি। নিজের ভাষাতেই লিখেছে, কিন্তু তার মধ্যে বানান ও ব্যাকরণ দুইয়েরই অনেক ভুল। ফলে মনে হয় ওর প্রোগ্রেস আমার চেয়ে অনেক বেশি ঢিমে। বাকি কয়জনের খবর জানি না। অনুমান করা যায় তাঁরা সকলেই বেঁচে আছেন, কারণ জাহাজে সুস্থ অবস্থায় উঠেছিলাম সকলেই। এখন ভাবতে ভয় হয় যে আমি যদি একা গিয়ে ফ্লোরোনাতে উপস্থিত হতাম, তা হলে আমাকে উদ্ধার করার জন্য ম্যানিলা থেকে কোনো জাহাজ আসত না। ফ্লোরোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ও অবিনাশবাবু দুজনেই সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতাম।

হ্যামলিনের চিঠিতে জানলাম যে আমি ক'দিন থেকে যেটা অনুমান করছি সেটা ঠিকই। আমরা সবাই একই স্বপ্ন দেখে একই আকর্ষণে ফ্লোরোনায় হাজির হয়েছিলাম। খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে আমরা আটজন ছাড়াও আরো বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ওই একই সময় একই স্বপ্ন দেখে ফ্লোরোনায় যাবার জন্য ছটফট করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ওই বেয়াড়া জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছানোর কোনো উপায় ছিল না।

ফ্লোরোনা-রহস্যের ষোল আনা সমাধান কোনদিনই হবে বলে মনে হয় না। তবে যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বাকিটা অনুমান করে নেওয়া কঠিন না। ফ্লোরোনায় যে এক বিচিত্র প্রাণীর খপ্পরে পড়তে হয়েছিল সেটা ত বুঝতেই পেরেছি। এই বোঝার ব্যাপারে অবিনাশবাবুর অবদান কম নয়। গত বুধবার ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এসে আমায় একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিলেন। হাতে নিয়ে রবারের টুকরো বলে মনে হল। ভদ্রলোকের দিকে চাইতেই তিনি হেসে বললেন, 'ফুলের ঘায়ে সত্যিই মূর্ছা গেসলুম মশাই। যে ফুল আপনার মাথায় চেপেছিল—এ হল তারই পাপড়ির একটা টুকরো।'

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জেনেছি এই পাপড়ির সঙ্গে পৃথিবীর কোনো ফুলের কোনো পাপড়ির মিল নেই। এই পাপড়ির অ্যানাটমি অবিশ্বাস্য রকম জটিল ; প্রায় একজন মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে-ধরনের জটিলতা থাকে, এতেও তাই।

ফ্লোরোনার পশ্চিম উপকূলে যাবার পর আমি কী করেছিলাম না-করেছিলাম, তা আমার মনে নেই, কিন্তু অবিনাশবাবুর বর্ণনা থেকে বুঝতে পারলাম এই ফুল কোনো আশ্চর্য উপায়ে আমার মস্তিষ্ক থেকে আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনেকটা নিংড়ে বার করে নিয়েছিল। তারপর একের পর এক আরো অন্য ফুলও এই কাজটি করার ফলে শেষে আমি যে অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, তার সঙ্গে একটা নির্বোধ শিশুর কোনো পার্থক্য নেই। হ্যামলিনদের সাতজনেরও এই একই ব্যাপার হয়েছিল।

অবিনাশবাবুর মতে আমাকে শোষণ করার পর গাছের রঙের জেল্লা নাকি আশ্চর্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয়—এবং সেটা এতই অস্বাভাবিক যে লিখতেও সঙ্কোচ বোধ করছি—ফ্লোরোনা দ্বীপের গাছপালার খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, যে জ্ঞান তারা শুষে নেয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক থেকে। শুধু তাই নয়, তেমন ভাবে ক্ষুধার্ত হলে এরা উর্বর মস্তিষ্ক লোকদের স্বপ্ন দেখিয়ে আকর্ষণ করে নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। পৃথিবীর গাছপালা পুষ্টিকর খাদ্য আহরণ করে বাতাস, মাটি ও সূর্যের আলো থেকে। এই তিনটি জিনিসের একটিও যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না সেটা পূর্ব উপকূলের গাছগুলো দেখেই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

সব শুনেটুনে অবিনাশবাবু বললেন, 'তা ত বুঝলাম—এরা না হয় জ্ঞান ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তাই বলে দ্বীপটা শেষ পর্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে গেল কেন বলুন ত?'

আমি বললাম, 'ফ্লোরোনা আসলে একটা দ্বীপ কিনা সে-বিষয়েও আমার মনে খটকা রয়েছে। আমার ত মনে হয় দ্বীপ না হয়ে অন্য কোন সৌরজগৎ থেকে ছট্‌কে আসা গ্রহ বা গ্রহের অংশও হতে পারে। এমনকি, অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রকেট জাতীয়ও কিছু হতে পারে।'

আমার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র কোত্থেকে জানি একটা ক্ষীণ, বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি তিনিও আমারই মতো হতভম্ব। টিমু ও নিউটনও দেখি খেলা থামিয়ে মেঝের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী হল? কিসের শব্দ? কে হাসল?

এবার দৃষ্টি গেল আমার গবেষণার সাজসরঞ্জাম রাখা টেবিলের একটা কোণের দিকে।

অবিনাশবাবুর দেওয়া পাপড়ির টুকরোটা সেখানে ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। নিচের দিকে চাইতে দেখলাম সেটা মাটিতে পড়ে আছে। অথচ আমি কিন্তু ফেলিনি।

পাপড়িটার রঙে কি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে?

ওসব আর ভেবে দরকার নেই। হাতের কাছেই দেরাজের মধ্যে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা ছিল ; পাপড়ির দিকে তাক করে সেটার ঘোড়া টিপে দিলাম।

অন্তর্হিত পাপড়িটার জায়গায় কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার থেকে দিনে দশ ঘণ্টা ঘুমোব।'

আমি বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রাত জেগে বই পড়ে মাথাটাকে জ্ঞানের ডিপো করে ত জীবনটাকে খোয়াতে বসেছিলেন। যা অবস্থা হয়েছিল আপনার তাকে ত ছিবড়ে ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না—আবার জিগ্যেস করছেন, কেন?'

ভদ্রলোককে দেবার মতো জুতসই কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

ছবি : সত্যজিৎ রায়
[পুনর্মুদ্রিত]

তারিণীখুড়োর গল্প

লখ্‌নৌর ডুয়েল

সত্যজিৎ রায়

'ডুয়েল মানে জানিস?' জিগ্যেস করলেন তারিণীখুড়ো।

'বাঃ, ডুয়েল জানব না?' বলল ন্যাপলা। 'ডুয়েল রোল, মানে দ্বৈত ভূমিকা। সন্তোষ দত্ত গুপী গাইনে ডুয়েল রোল করেছিলেন— হাল্লার রাজা, শুণ্ডীর রাজা।'

'সে ডুয়েলের কথা বলছি না,' হেসে বললেন তারিণীখুড়ো। 'ডি-ইউ-এ-এল নয়, ডি-ইউ-ই-এল ডুয়েল। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে লড়াই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি জানি!' আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

'এই ডুয়েল নিয়ে এককালে কিছু পড়াশুনা করেছিলুম নিজের শখে,' বললেন তারিণীখুড়ো। 'ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালি থেকে ডুয়েলিং-এর রেয়াজ ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তরোয়াল জিনিসটা ছিল ভদ্রলোকদের পোশাকের একটা অঙ্গ,

আর অসি-চালনা বা ফেনসিং শেখাটা পড়ত সাধারণ শিক্ষার মধ্যে। একজন হয়ত আরেকজনকে অপমান করল, অমনি অপমানিত ব্যক্তি ইজ্জত বাঁচাবার খাতিরে অন্যজনকে ডুয়েল চ্যালেঞ্জ করল ; এই চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করাটা রেয়াজের মধ্যে পড়ত, ফলে সোর্ড ফাইট শুরু হয়ে যেতো। মান যে বাঁচবেই এমন কোনো কথা নেই, কারণ যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি অসি চালনায় তেমন নিপুণ নাও হতে পারেন। কিন্তু তাও চ্যালেঞ্জ করা চাই, কারণ অপমান হজম করাটা সেকালে অত্যন্ত হেয় বলে গণ্য হত।

'বন্দুক-পিস্তলের যুগে অবিশ্যি পিস্তলই হয়ে গেল ডুয়েলিং-এর অস্ত্র। সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। এই ডুয়েলিং-এ তখন এত লোক মরত আর জখম হত যে এটাকে বেআইনী করার চেষ্টা ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। কিন্তু এক রাজা আইন করে বন্ধ করলেন ত পরের রাজা ঢিলে দেওয়াতে আবার চালু হয়ে গেল ডুয়েলিং। আর কতরকম তার আইনকানুন! — দুজনকেই হুবহু একরকম অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, দুজনেরই একটি করে "সেকেন্ড" বা আম্পায়ার থাকবে যাতে কারচুপির রাস্তা বন্ধ হয় ; দুজনকেই দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় যাতে পরস্পরের মধ্যে আন্দাজ বিশ গজের ব্যবধান থাকে, আর চ্যালেঞ্জারের সেকেন্ড "ফায়ার" বলা মাত্র দুজনের একসঙ্গে গুলি চালাতে হবে। তোরা জানিস কিনা জানি না, এই ভারতবর্ষেই— না ভারতবর্ষ কেন— এই কলকাতাতেই, আজ থেকে দুশো বছর আগে এক বিখ্যাত ডুয়েল লড়াই হয়েছিল?'

ন্যাপলাও দেখলাম জানে না ; সেও আমাদের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'যে দুজন লড়েছিলেন,' বললেন তারিণীখুড়ো, 'তাঁদের একজন ত জগদ্বিখ্যাত। তিনি হলেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রতিপক্ষের নাম ফিলিপ ফ্রানসিস। ইনি ছিলেন বড়লাটের কাউনসিলের সদস্য। হেস্টিংস কোনো কারণে ফ্রানসিসকে একটি অপমানসূচক চিঠি লেখেন। ফ্রানসিস তখন তাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করে। আলিপুরে এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারই কাছে একটা খোলা জায়গায় এই ডুয়েল হয়। ফ্রানসিস চ্যালেঞ্জ করেছেন, ফলে তারই এক বন্ধুকে জোড়া-পিস্তল জোগাড় করতে হল, এবং তিনিই "ফায়ার" বলে চেঁচালেন। পিস্তলও চলেছিল একই সঙ্গে, কিন্তু মাটিতে জখম হয়ে পড়ল মাত্র একজনই— ফিলিপ ফ্রানসিস। তবে সুখের বিষয় সে-জখম মারাত্মক হয়নি।'

'ইতিহাস ত হল,' বলল ন্যাপলা, 'এবার গল্প হোক্। ডুয়েলিং যখন আপনার মাথায় ঘুরছে, তখন মনে হচ্ছে ডুয়েল নিয়ে নির্ঘাৎ আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে।'

খুড়ো বলল, 'তোরা যা ভাবছিস সেরকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও, যা আছে শুনলে তাক্ লেগে যাবে।'

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিয়ে, পকেট থেকে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ির প্যাকেট আর

দেশলাইটা বার করে পাশে তক্তপোষের ওপর রেখে তারিণীখুড়ো তাঁর গল্প শুরু করলেন—

আমি থাকি তখন লখ্‌নৌতে। রেগুলার চাকরি বলে কিছু নেই, এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই, কারণ তার বছর দেড়েক আগে রেঞ্জার্সের লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে, তার সুদেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি বলছি ফিফ্‌টি ওয়ানের কথা। তখনও আর এমন ম্যাগির বাজার ছিল না, আমি একা মানুষ, মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা হলে দিব্যি আরামে চলে যেত। লাটুশ রোডে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়ি নিয়ে থাকি, 'পায়োনীয়ার' কাগজে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে চুট্‌কি গোছের লেখা লিখি, আর হজরতগঞ্জের একটা নিলামের দোকানে যাতায়াত করি। নবাবদের আমলের কিছু কিছু জিনিস তখনও পাওয়া যেত। সুবিধের দাম পেলে ধনী আমেরিকান টুরিস্টদের কাছে বেচে বেশ বেশ টুপাইস লাভ করা যেত। অবিশ্যি আমার নিজেরও যে শখ ছিল না তা নয়। আমার বৈঠকখানা ছোট হলেও তার অনেক জিনিসই ছিল এই নিলামের দোকানে কেনা।

এক রবিবার সকালে দোকানে গিয়ে দেখি জিনিসপত্তরের মধ্যে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মেহগানি কাঠের বাক্স, এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া, ইঞ্চি তিনেক পুরু। ভেতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে পারলাম না, তাই জিনিসটা সম্বন্ধে কৌতূহল গেল বেড়ে। নিলামে অনেক জিনিসই উঠেছে, কিন্তু আমার মনটা পড়ে রয়েছে ওই বাক্সের দিকে।

অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেখলুম নিলামদার বাক্সটাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। আমি টান হয়ে বসলুম। যথারীতি গুণকীর্তন শুরু হল। — 'এবারে একটি অতি লোভনীয় জিনিস আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর জুড়ি পাওয়া ভার। দেখুন, এই যে ঢাকনা খুলছি আমি। দুশো বছরের পুরোন জিনিস, অথচ এখনো এর জেল্লা অম্লান রয়েছে। জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যানটনের ছাপমারা এক জোড়া ডুয়েলিং পিস্তল! এই জোড়ার আর জুড়ি নেই!..'

আমার ত দূর থেকে দেখেই হয়ে গেছে। ও জিনিসটা আমার চাই। আমার কল্পনা তখনই খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের বিশ হাত দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ফায়ার!' শোনামাত্র গুলি চালাচ্ছে, আর তার পরেই রক্তাক্ত ব্যাপার!

এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে, নিলামও হয়ে চলেছে, চারবাগের এক গুজরাটি ভদ্রলোক সাড়ে সাত শো বলার পর আমি ধাঁ করে হাজার বলাতে দেখলাম ডাকাডাকি বন্ধ হয়ে গেল, ফলে বাক্স সমেত পিস্তল দুটি আমারই হয়ে গেল।

জিনিসটা দোকানে দেখে যতটা ভালো লেগেছিল, বাড়িতে এসে হাতে নিয়ে তার চেয়ে যেন শতগুণে বেশি ভালো লাগল। পিস্তলের মতো পিস্তল বটে। যেমন তার বাঁট, তেমনি তার নল। পুরো পিস্তল প্রায় সতের ইঞ্চি লম্বা। তার গায়ে পরিষ্কার খোদাই করা রয়েছে মেকারের নাম— জোসেফ ম্যান্টন। বন্দুক সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা আগেই করা ছিল ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলন্ডে বন্দুক বানিয়ে হিসেবে যাদের সবচেয়ে বেশি নামডাক ছিল, তার মধ্যে জোসেফ ম্যান্টন হলেন একজন।

লখ্‌নৌ গিয়েছি সবে মাস তিনেক হল। ওখানে বাঙালীর সংখ্যা বিশেষ কম নয়, কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাদের কারুর সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। সন্ধ্যাবেলাটা মোটামুটি বাড়িতেই থাকি ; আমি ছাড়া থাকে একজন রান্নার লোক আর একটি চাকর। পিস্তল দুটো কেনা অবধি মাথায় ডুয়েলিং সংক্রান্ত একটা প্লট ঘুরছে, তাই খাতা-কলম নিয়ে আরাম কেদারায় বসেছি এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। কোনো বিদেশী খদ্দের নাকি? পুরোন জিনিসের সাপ্লায়ার হিসেবে আমার কিছুটা পরিচিতি এর মধ্যেই হয়ে গেছে।

গিয়ে দরজা খুললুম। একজন সাহেবই বটে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বোঝাই যায় এদেশে অনেকদিনের বাসিন্দা, এমন কি জন্মও হয়ত এখানেই। অর্থাৎ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

'গুড ইভিনিং।'

আমিও প্রত্যভিবাদন জানালুম। সাহেব বলল, 'একটু দরকার ছিল। ভেতরে বসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

সাহেবের উচ্চারণে কিন্তু দোআঁশলা ভাব নেই একদম।

ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় এনে বসালাম। এইবার আলোয় চেহারাটা আরো স্পষ্ট বোঝা গেল। সুপুরুষই বলা চলে। চুল কটা। একজোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ তাও কটা, চোখের মণি

নীল, পরনে ছেয়ে রঙের সুট। আমি বললুম, 'সাহেব, আমি ত মদ খাই না, তবে যদি বলো ত এক পেয়ালা চা বা কফি করে দিতে পারি।' সাহেব বললে যে তার কিছুরই দরকার নেই, সে এইমাত্র বাড়ি থেকে ডিনার খেয়ে আসছে। তারপর তার আসার কারণটা বললে।

'তোমায় আজ সকালে দেখলাম হজরতগঞ্জের অকশন হাউসে।'

'তুমিও ছিলে বুঝি সেখানে?'

'হ্যাঁ— কিন্তু তুমি এত তন্ময় ছিলে তাই বোধহয় খেয়াল করনি।'

'আসলে একটা জিনিসের ওপর খুব লোভ ছিল—'

'সেটা ত তোমারই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ডুয়েলিং পিস্তল— জোসেফ ম্যান্টনের তৈরি। ইউ আর ভেরি লাকি!'

আমি একটা কথা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'ওটা কি তোমার কোনো চেনা লোকের সম্পত্তি ছিল?'

'হ্যাঁ, তবে সে বহুদিন হল মারা গেছে। তারপর কোথায় চলে গিয়েছিল জিনিসটা জানতাম না। ওটা কি আমি একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি? কারণ ওটার সঙ্গে একটা কাহিনী জড়িত রয়েছে, তাই... '

আমি সাহেবের হাতে পিস্তলের বাক্সটা দিলুম। সাহেব সেটা খুলে পিস্তলটা বার করে উদ্ভাসিত চোখে সেটা ল্যাম্পের কাছে নিয়ে গিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'এই পিস্তল দিয়ে এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল এই লখ্‌নৌ শহরে সেটা বোধহয় তুমি জান না?'

'লখ্‌নৌতে ডুয়েল!'

'হ্যাঁ। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের ঘটনা। একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। সত্যি বলতে কি, আর তিন দিন পরেই ঠিক দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। ষোলই অক্টোবর।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'খুব আশ্চর্য ত! কিন্তু ডুয়েলটা কাদের মধ্যে হয়েছিল—'?

সাহেব পিস্তলটা ফেরত দিয়ে আবার সোফায় বসে বললে, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শোনা যে আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। ...ডাঃ জেরিমায়া হাডসনের মেয়ে অ্যানাবেলা হাডসন তখন ছিল লখ্‌নৌ-এর নামকরা সুন্দরী। ডাকসাইটে তরুণী ; ঘোড়া চালায়, বন্দুক চালায়— দুটোই পুরুষের মতো। এদিকে আবার ভালো নাচতে পারে, গাইতে পারে। সেই সময় লখ্‌নৌতে এক তরুণ ইংরেজ আর্টিস্ট এসে রয়েছেন, নাম জন ইলিংওয়ার্থ। তার আসল মতলব নবাবের ছবি এঁকে ভালো ইনাম পাওয়া, কিন্তু অ্যানাবেলার সৌন্দর্যের কথা শুনে আগে তার একটা পোর্ট্রেট করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। ছবিও হল বটে, কিন্তু তার আগেই ইলিংওয়ার্থ অ্যানাবেলাকে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছে।

'এদিকে তারই কিছুদিন আগে একটা পার্টিতে অ্যানাবেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চার্লস ব্রুসের। লখ্‌নৌ ক্যান্টনমেন্টে তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা বড় অংশ ছিল, তারই ক্যাপ্টেন ছিলেন চার্লস ব্রুস। ব্রুসও প্রথম দর্শনেই অ্যানাবেলার প্রেমে পড়ে গেলেন।

'পার্টির দুদিন বাদে আর থাকতে না পেরে অ্যানাবেলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন ব্রুস। গিয়ে দেখেন একটি অচেনা তরুণ অ্যানাবেলার ছবি আঁকছে। ইলিংওয়ার্থ তেমন জোয়ান পুরুষ না হলেও চেহারাটা তার মন্দ ছিল না। তার হাবভাবে সেও যে অ্যানাবেলার প্রতি অনুরক্ত এটা বুঝতে ব্রুসের দেরি লাগল না। শিল্পী জাতটাকে ব্রুস এমনিতেই অবজ্ঞা করে, বর্তমান ক্ষেত্রে সে অ্যানাবেলার সামনেই ইলিংওয়ার্থকে একটা অপমানসূচক কথা বলে বসল।

'ইলিংওয়ার্থের মধ্যে যা গুণ ছিল তা সবই শিল্পীসুলভ গুণ, আর তার প্রবৃত্তিগুলি ছিল কোমল। কিন্তু আজ অ্যানাবেলার সামনে এই অপমান সে হজম করতে পারল না। সে ব্রুসকে ডুয়েল চ্যালেঞ্জ করে বসল। ব্রুসও খুশি মনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। ডুয়েলের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল— ষোলই অক্টোবর, ভোর ছটা।

'তুমি জান বোধহয় যে যারা ডুয়েল লড়বে তাদের একজন করে সেকেন্ডের দরকার হয়?'

আমি বললাম, 'জানি। এরা আম্পায়ারের কাজ করে, অর্থাৎ লক্ষ রাখে যে ডুয়েলের নিয়মগুলো ঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা।'

'হ্যাঁ। সচরাচর এই সেকেন্ডটি হয় যে ডুয়েল লড়বে তার বন্ধুস্থানীয় কেউ। লখ্‌নৌ শহরে ইলিংওয়ার্থের পরিচিতের সংখ্যা বেশি না হলেও, সরকারী দপ্তরের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়েছিল। এঁর নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থ ড্রামন্ডকে অনুরোধ করল এক জোড়া ভালো পিস্তল জোগাড় করে দিতে, কারণ ডুয়েলের নিয়ম অনুযায়ী দুটো পিস্তল ঠিক একরকম হওয়া চাই। এ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের দ্বিতীয় অনুরোধ হল ড্রামন্ড যেন তার সেকেন্ডের কাজ করে। ড্রামন্ড রাজি হল। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ব্রুসও তার বন্ধু ফিলিপ মক্সনকে তাঁর সেকেন্ড করলেন।

'ডুয়েলের দিন এগিয়ে এল। এর ফলাফল যে কী হবে সে সম্বন্ধে কারুর মনে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ পিস্তলে ক্যাপ্টেন ব্রুসের লক্ষ্য অব্যর্থ, আর ইলিংওয়ার্থ তুলি চালনায় নিপুণ হলেও পিস্তল চালনায় একেবারেই অপটু।'

এই পর্যন্ত বলে সাহেব থামলেন। আমি ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করলুম, 'শেষ পর্যন্ত কী হল?

সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'প্রতি বছর ষোলই অক্টোবর ভোর ছটায় কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

'কোথায়?'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেখানে। দিলখুশার পশ্চিমে গুমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নিচে।'

'পুনরাবৃত্তি মানে?'

'যা বলছি তাই। ওখানে তরশু ভোর ছটায় গেলে পুরো ঘটনাই চোখের সামনে ঘটতে দেখবে।'

'বলছ কী! এ তো ভৌতিক ব্যাপার!'

'আমার কথা মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তুমি নিজেই গিয়ে যাচাই করে এসো তিনদিন পরে।'

'কিন্তু আমি কি জায়গাটা ঠিক চিনে যেতে পারব? আমি ত বেশিদিন হল এখানে আসিনি। লখ্‌নৌ-এর ভূগোলটা এখনো—'

'তুমি দিলখুশা চেনো ত?'

'তা চিনি।'

'দিলখুশার বাইরে আমি পৌনে ছটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'বেশ। তাই কথা রইল।'

সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপরই খেয়াল হল যে ভদ্রলোকের নামটাই জানা হয়নি। অবিশ্যি উনিও আমার নাম জিগ্যেস করেন নি। যাই হোক, নামটা বড় কথা নয়; যে কথাগুলো উনি বলে গেলেন সেগুলোই হল আসল। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এই শহরেই এককালে এরকম রোমান্টিক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, এবং আমারই হাতে রয়েছে এক জোড়া পিস্তল যেগুলো এই ঘটনায় একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে জুটল অ্যানাবেলা হাডসন? এবং আরো একটা প্রশ্ন— এই দুজনকে মধ্যে কাকে ভালোবেসেছিল অ্যানাবেলা?

আশা করি ষোল তারিখের অভিযানেই এইসব প্রশ্নের জবার মিলবে।

ক্রমে এগিয়ে এল ষোলই অক্টোবর। পনরই রাত্তিরে একটা গানের জলসা থেকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় দেখা সেই সাহেবের সঙ্গে। বলল, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম তোমাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি যে শুধু ভুলিনি তা নয়, অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আগামীকাল সকালের জন্য অপেক্ষা করে আছি।' সাহেব চলে গেল।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভোর পাঁচটায় উঠে এক কাপ চা খেয়ে গলায় একটা মাফ্‌লার চাপিয়ে নিয়ে একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম দিলখুশার উদ্দেশে। শহরের একটু বাইরে দিলখুশা এককালে ছিল নবাব সাদাত আলির বাগানবাড়ি। চারিদিকে ঘেরা প্রকাণ্ড পার্কে হরিণ চরে বেড়াত। কখনো-সখনো জঙ্গল থেকে এক-আধটা চিতাবাঘও নাকি এসে পড়ত বাড়ির ত্রিসীমানায়। এখন সে বাড়ির শুধু খোলটাই রয়েছে। তবে তার পাশে একটা ফুলবাগিচা এখনো মেনটেন করা হয়, লোকে সেখানে বেড়াতে যায়।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম, 'তমি যদি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কর, তাহলে আমি আবার এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারি।' উর্দুটা ভালো জানা ছিল আগেই, তাই বোধহয় খানদানী আদমি ভেবে টাঙ্গাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের পাশে দেখি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। বললে সেও নাকি মিনিট পাঁচেক হল এসেছে।

'লেট্‌স গো দেন।'

বললুম, 'চলো সাহেব— তুমিই ত পথ জান, তোমার পিছু নেব আমি।'

মিনিট পাঁচেক হাঁটতেই একটা খোলা মাঠে এসে পড়লুম। দূরে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ চারিদিক একটা আবছা কুয়াশার ঢাকা। হয়ত ডুয়েলের দিনেও ঠিক এমনি কুয়াশা ছিল!

আগাছা আর কাঁটা ঝোপে ঘেরা একটা পোড়ো বাড়ির কাছে এসে সাহেব থামল। দেখেই বোঝা যায় সেটা প্রাচীনকালে কোনো সাহেবের বাড়ি ছিল। অবিশ্যি আমাদের কারবার এই বাড়িটাকে নিয়ে নয়। সেটাকে পিছনে ফেলে আমরা দাঁড়ালাম পুব দিকে মুখ করে। কুয়াশা হলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামনে কিছু দূরে রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ, আর তার ডাইনে আমাদের থেকে হাত চল্লিশেক দূরে রয়েছে একটা বেশ বড় ঝোপ। আর সব কিছুর পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গুমতী নদী। নদীর পিছনে কুয়াশা হলেও, আন্দাজ করা যায় ও দিকটায় বসতি নেই। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

'শুনতে পাচ্ছ?' সাহেব হঠাৎ জিগ্যেস করল।

কান পাততেই শুনতে পেলুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ। গাটা যে ছমছম করছিল না তা বলতে পারি না। তবে তার সঙ্গে একটা অভিনব অভিজ্ঞতার চরম প্রত্যাশা।

এইবার দেখলুম দুই অশ্বারোহীকে। আমাদের বাঁ দিকে বেশ দূর দিয়ে এসে তেঁতুল গাছটার নিচে দাঁড়াল।

'এরা দুজনেই কি লড়বেন?' আমি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলুম।

সাহেব বলল, 'দুজন নয়, একজন। দুজনের মধ্যে লম্বাটি হলেন জন ইলিংওয়ার্থ, অর্থাৎ

যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। অন্যজন ইলিংওয়ার্থের সেকেন্ড ও বন্ধু, হিউ ড্রামন্ড। ওই দেখ ড্রামন্ডের হাতে সেই মেহগানি বাক্স।

সত্যিই ত! এবার বুঝলুম আমার রক্ত চলাচল দ্রুত হতে শুরু করেছে। আমি যে দেড়শ বছর আগের একটি ঘটনা আজ ১৯৫০ সালে লখ্‌নৌ শহরে দাঁড়িয়ে দেখতে চলেছি, সেই চিন্তা আমার হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়ায় ক্যাপ্টেন ব্রুস ও তাঁর সেকেন্ড ফিলিপ মক্সন এসে পড়লেন। তারপর ড্রামন্ড বাক্স থেকে পিস্তল দুটো বার করে তাতে গুলি ভরে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থের হাতে দিয়ে তাদের যেন কি সব বুঝিয়ে দিলেন।

পিছনের আকাশ গোলাপি হতে শুরু করেছে, গুমতীর জলে সেই রং প্রতিফলিত।

ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ এবার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দুজনেই গুণে গুণে চোদ্দ পা হেঁটে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মুখোমুখি হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো শব্দ শুনতে পাইনি, কিন্তু এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল উঁচিয়ে পরস্পরের দিকে তাক করার পর স্পষ্ট কানে এল ড্রামন্ডের আদেশ—

'ফায়ার!'

পরমুহূর্তেই শুনলাম এক সঙ্গে দুই পিস্তলের গর্জন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ব্রুস ও ইলিংওয়ার্থ দুজনের দেহই একসঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গে আরেকটি দৃশ্য আমাকে আরো অবাক করে দিল। যেই ঝোপটার কথা বলছিলাম, সেটার পিছন থেকে এক মহিলা ছুটে বেরিয়ে কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'ফলাফল ত দেখলে', বলল সাহেব। 'এই ডুয়েলে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল।'

বললাম, 'তা ত বুঝলাম, কিন্তু ঝোপের পিছন থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে চলে গেলেন, তিনি কে?'

'দ্যাট ওয়াজ অ্যানাবেলা।'

'অ্যানাবেলা!'

'ইলিংওয়ার্থের গুলিতে ক্যাপ্টেন ব্রুস মরবে না এটা অ্যানাবেলা বুঝেছিল— অথচ ওর দরকার ছিল যাতে দুজনেই মরে। তাই সে আর ঝুঁকি না নিয়ে "ফায়ার" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পিস্তল দিয়ে ব্রুসকে মারে। ইলিংওয়ার্থের গুলি ব্রুসের গায়ে লাগেইনি।'

'কিন্তু অ্যানাবেলার এই আচরণের কারণ কী?'

'কারণ সে ওই দু'জনের একজনকেও ভালোবাসেনি। ও বুঝেছিল ইলিংওয়ার্থ মরবে, এবং ব্রুস বেঁচে থেকে ওকে বিরক্ত করবে। সেটা ও চায়নি, কারণ সে আসলে ভালোবাসত আরেকজনকে— যাকে সে পরে বিয়ে করে এবং যার সঙ্গে সে সুখে ঘর করে।'

আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে দেড়শ বছরের পুরোন ডুয়েলের দৃশ্য দ্রুত মিলিয়ে আসছে। কুয়াশাও যেন আরো ঘন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য মহিলা অ্যানাবেলার কথা ভাবছি, এমন সময় একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম।

'হিউ! হিউই!'

'অ্যানাবেলা ডাকছে', বললেন সাহেব।

আমার দৃষ্টি এবার সাহেবের দিকে ঘুরতেই শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল। এ কাকে দেখছি চোখের সামনে? এর পোশাক বদলে গেল কি করে? — এ যে সেই দেড়শ বছর আগের পোশাক!

'তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়া হয়নি,' বলল সাহেব, তার গলার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। — 'আমার নাম হিউ ড্রামন্ড। ইলিংওয়ার্থের বন্ধুকেই ভালোবাসত অ্যানাবেলা। গুড বাই...'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলাম সাহেব ওই পোড়ো বাড়িটার দিকে অগ্রসর হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টাঙ্গা করে বাড়ি ফিরে মেহগানির বাক্সটা খুলে পিস্তলদুটো আরেকবার বার করলাম। নলে হাত পড়তে গরম লাগল। এবার নলের মুখটা নাকের কাছে আনলাম। টাটকা বারুদের গন্ধ।

ছবি : সত্যজিৎ রায়

[পুনর্মুদ্রিত]

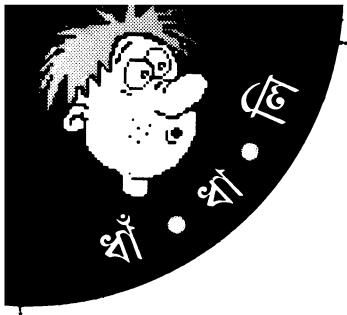

ছিল এগারো, গেল দুই, হল এক

সেদিন আমি আর গণপতি গিয়েছি গোবর্ধনের বাড়ি। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন বলল, "ছিল এগারো, গেল দুই, হল এক।" আমরা থমকে দাঁড়ালাম। ব্যাপার কী! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি গোবর্ধনের?

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, "ওরে, এসব কী বলছিস তুই?"

গোবর্ধন আবার বলল, "ছিল এগারো, গেল দুই, হল এক।"

আমরা দু'জনে প্রায় সমস্বরে বললাম, "তার মানে কী?"

গোবর্ধন বলল, "বেজেছিল এগারোটা, দু'-ঘণ্টা চলে গেল, এখন বাজে একটা।"

কথাটা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম দু'জনে। গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বাব্বা, কী ধাঁধায় ফেলেছিলিস তুই।"

আসলে, ধাঁধার ব্যাপারটাই এরকম। বুঝলে, যেন একেবারে জল। তার আগে পর্যন্ত হতভম্ব হওয়া আর বোকা বনে যাওয়া!

আজ এখানে এরকম তিনটি ধাঁধার কথা বলছি।

বিতর্ক তুমুল

বাবুই নিজে যদিও কোনও সাতে-পাঁচে নেই, আমাকে কিন্তু সেদিন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল। "আচ্ছা বল তো, এমন কী জিনিস যা ধাঁধালিতে আছে, কিন্তু আনন্দমেলাতে নেই?"

পাশে থেকে মুনিয়া বলল, "অসম্ভব! ধাঁধালি তো আনন্দমেলারই একটা পাতা। তা হলে, ওই পাতায় থাকলে বইয়ে থাকবে না কেন? কথাটা যেন, ভারতে আছে, পৃথিবীতে নেই এই ধরনের! ভারত কি পৃথিবীর বাইরে?"

এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক ওদের দু'জনের। মধ্যিখান থেকে আমাকে কিছু বলতে হল না। খবরটা আনন্দমেলার বন্ধুদের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। যদি কোনও সুরাহা হয়।

গণপতির ভাইবোন

গণপতিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তোরা ক' ভাই বোন রে গণপতি?"

গণপতি উত্তর দিয়েছিল, "আমার ভাই যতজন, বোনও ততজন। কিন্তু প্রত্যেক বোনের আবার যতজন ভাই, বোনের সংখ্যা তার অর্ধেক।"

তা হলে গণপতিরা ক'ভাই বোন?

আজব ছবির ইতিকথা

একবার গোবর্ধনের সঙ্গে এক মজার দেশে বেড়াতে গিয়ে সে কী কাণ্ড!

সেখানকার লোকদের ভাষা বুঝি না, কথা বুঝি না, কী যে লিখে যাচ্ছে দিনরাত, তাও বুঝি না। আমি হতাশ হয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়লাম। গোবর্ধন হাতে একখানা আতসকাচ নিয়ে কীসব দেখে যাচ্ছিল।

হঠাৎ 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠল গোবর্ধন।

আমি উঠে গিয়ে দেখি, পুরনো এক দেওয়ালের গায়ে কেমন সব অদ্ভুতুড়ে ছবি। সব কেমন খাপছাড়া বলে মনে হল আমার।

গোবর্ধন বলল, "এই আজব ছবির ইতিকথা আমি জানি। আসলে, কিছু একটা লেখা হচ্ছিল তবে তা অসম্পূর্ণ। এর পরের ছবিটা কেমন হবে আমি তা বলে দিতে পারি।"

আমি অবশ্য মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। এখানে দেওয়ালের ছবিটা হুবহু তুলে দিলাম আনন্দমেলার বন্ধুদের জন্য। তারা যদি কিছু করতে পারে।

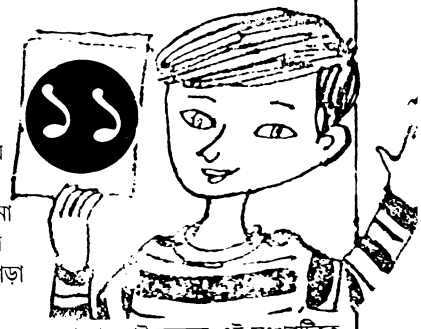

কারণ, আট অঙ্কের এই সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ করলে গুণফলে থাকে নয়টি ১ সুন্দরভাবে সাজানো:

১২৩৪৫৬৭৯×৯ = ১১১ ১১১ ১১১

দ্বিতীয় ধাঁধা

দুটি পাঁচে একশো পঁচিশ করা যায় এইভাবে,

|৫ + ৫ = ১২৫

|৫ হল গৌণিক পাঁচ, যার অর্থ ৫×৪×৩×২×১ = ১২০

১৯ এপ্রিলের ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধা

সংখ্যাটি হল ১২৩৪৫৬৭৯

তৃতীয় ধাঁধা : আজব সার্কাস

সংলগ্ন চিত্রে রেখা টেনে উত্তরটি বোঝানো হল।

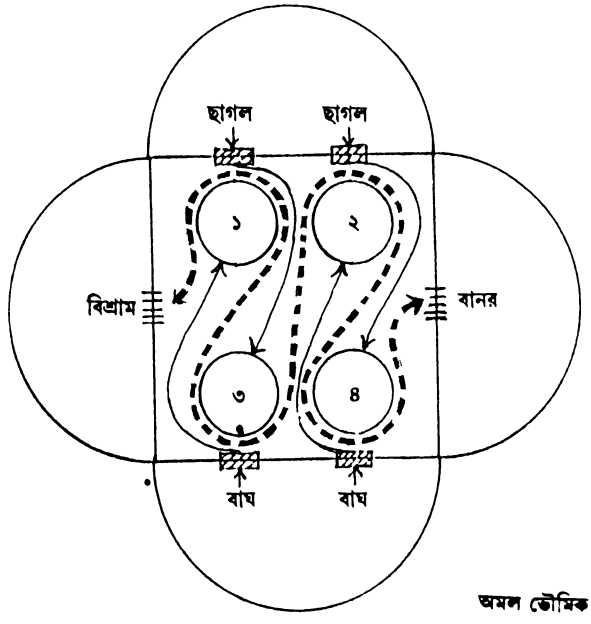

অমল ভৌমিক

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফুল স্পিডে যাচ্ছে। ট্রেনটাকে ধরে ফেলব। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা ট্রেনের রে স্ত রাঁ-কারে ঢুকে পড়ব।
এত স্পিড, আমার ভয় করছে। ...না তাকানোই ভাল!

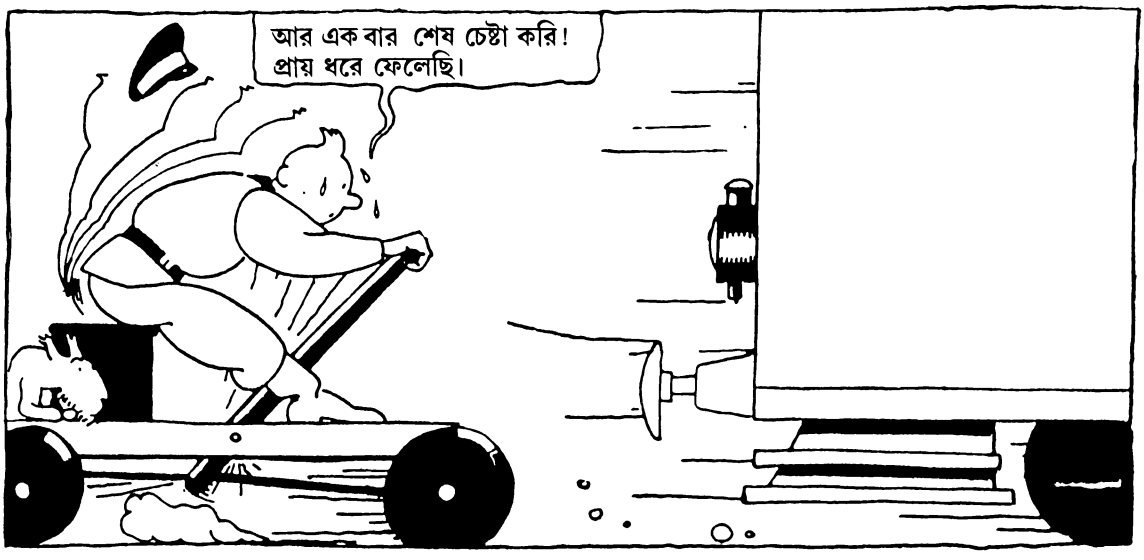
আর এক বার শেষ চেষ্টা করি! প্রায় ধরে ফেলেছি।

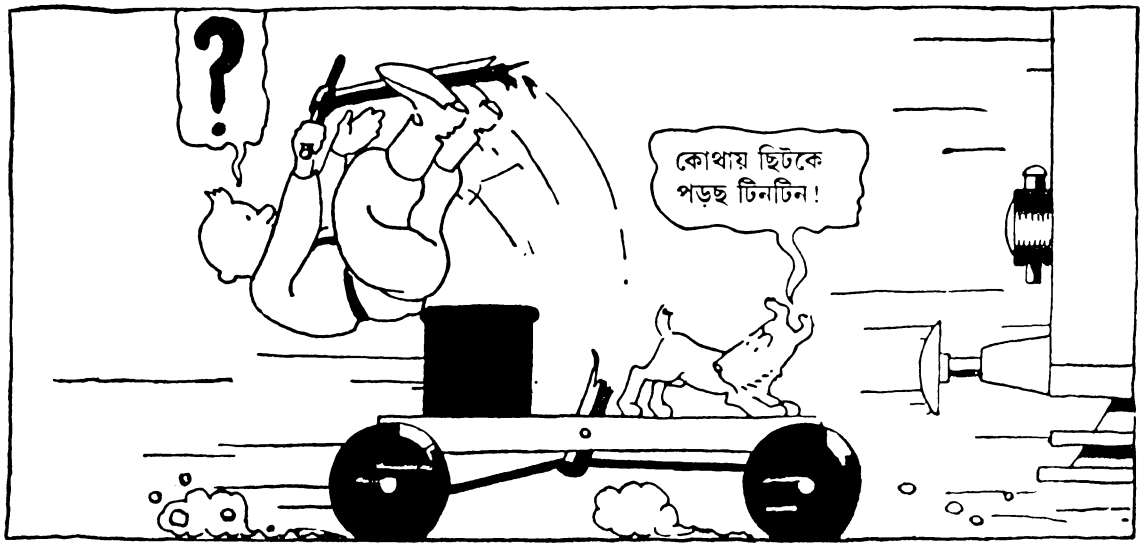
?
কোথায় ছিটকে পড়ছ টিনটিন!

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস এ

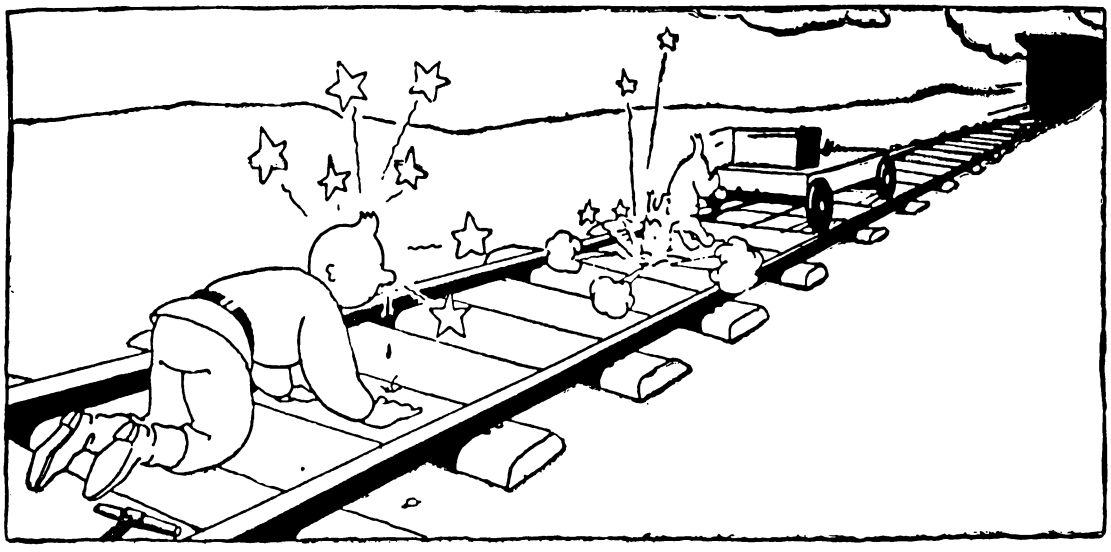

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

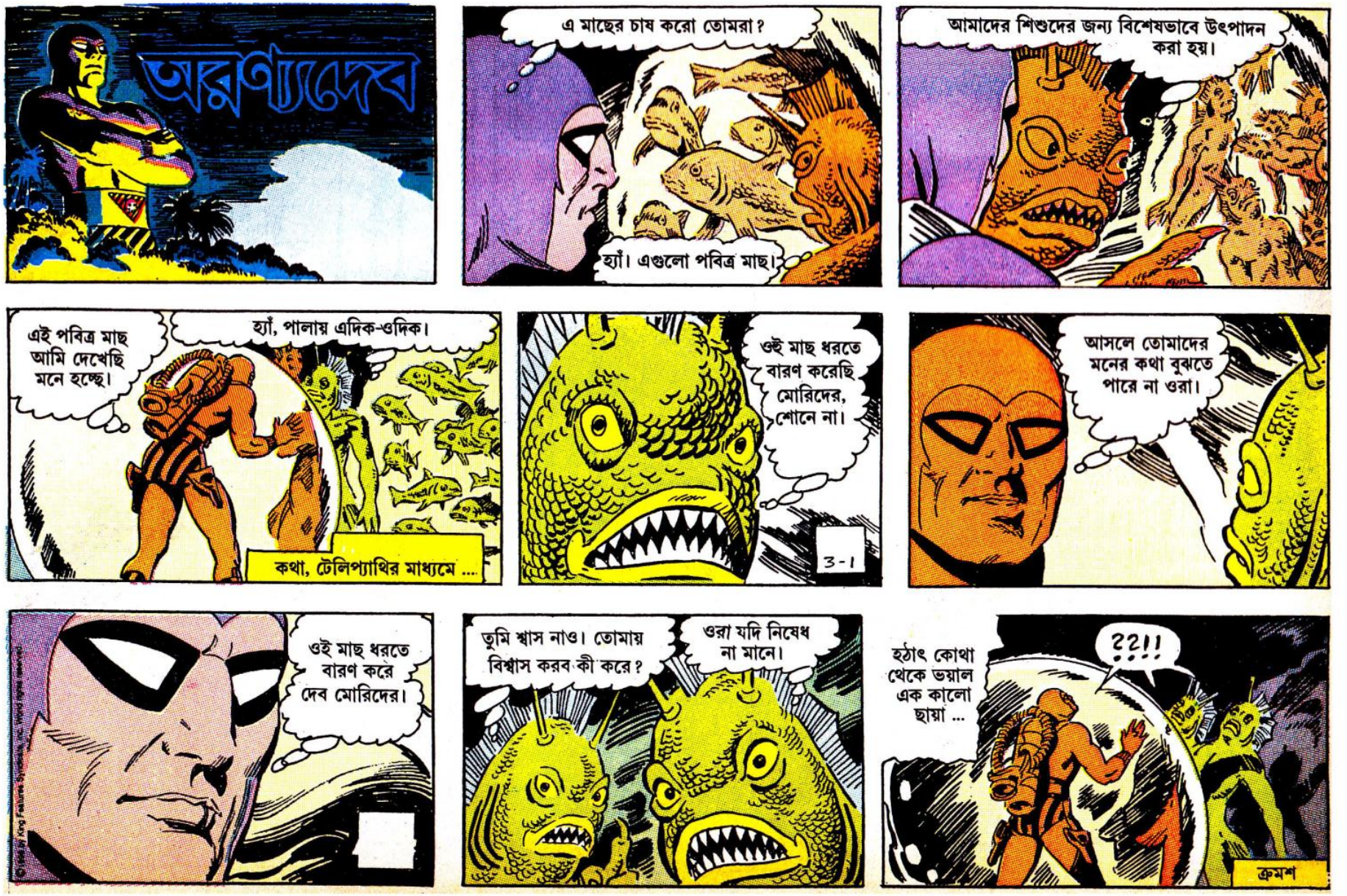
অরণ্যদেব
এ মাছের চাষ করো তোমরা?
হ্যাঁ। এগুলো পবিত্র মাছ।
আমাদের শিশুদের জন্য বিশেষভাবে উৎপাদন করা হয়।
এই পবিত্র মাছ আমি দেখেছি মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ, পালায় এদিক-ওদিক।
কথা, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে ....
ওই মাছ ধরতে বারণ করেছি মোরিদের, শোনে না।
3-1
আসলে তোমাদের মনের কথা বুঝতে পারে না ওরা।
ওই মাছ ধরতে বারণ করে দেব মোরিদের।
তুমি শ্বাস নাও। তোমায় বিশ্বাস করব কী করে?
ওরা যদি নিষেধ না মানে।
হঠাৎ কোথা থেকে ভয়াল এক কালো ছায়া ...
??!!
ক্রমশ

খাদিম-এর ইজবরল

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমত সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

চেগছোঁরোয়া

আবাশজিত

লেকমমিকানী

কালিবুলাওয়া

বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের দাম

এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান।

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

নামতা মুখস্থ করতে গিয়ে ছাত্রদের চোখে যা হয়

ধা রা পা ত

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : পাতালরেল, রাবণবধ, জনহিতকর, জীবনধারণ।

ঘোষক

বে	হি	সা	বি	■	বি	মা	ন	■	বী
ত	■	দা	বি	দা	র	■	ম	ন্দি	র
স	ন্ত্র	ম	■	রা	ত	■	স্কা	■	ব
ব	■	ন	নি	■	■	ক	র	বা	ল
ন	গ	■	রা	■	শি	র	■	জ	■
■	ল	■	ম	ণি	■	ত	■	না	চ
অ	তি	শ	য়	■	■	ল	ব	■	রি
গ্র	■	কু	■	ধ	রা	■	ক	বি	তা
ব	স	ন্ত	■	ম	গ	ডা	ল	■	মৃ
তী	■	লা	জু	ক	■	ক	স	র	ত

১৯ এপ্রিল সংখ্যার শব্দ সন্ধানের প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতা :

কৌশিক দে, রাজীবপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ; করুণা রায়বর্মন, কদমতলা, হাওড়া ; অভিষেক রায়, কলকাতা ৪।

দেবসেনাপতি

শব্দসন্ধান

১	২		৩	■	৪		৫		৬
■		■	৭	৮		■		■	
৯	■	১০			■	■	১১		
	■		■	১২		১৩		■	■
১৪	১৫		১৬	■	■		■	১৭	১৮
১৯		■		■	■	২০	২১		
■	■	২২			২৩	■	■	■	
২৪			■	■	২৫	২৬		■	
	■		■	২৭			■	২৮	■
২৯					■	৩০			

সংকেত : পাশাপাশি :

(১) জগদীশ্বর, ভগবান। (৪) কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর শেষ আশ্রয়। (৭) —মন্দ তাই চাকরিটা হল না। (১০) লজ্জা। (১১) খেলা দেখার পর বাসে—ঝোলা হয়ে ফিরতে হল। (১২) বড় দাতা, দাতাশ্রেষ্ঠ। (১৪) পদ্ম। (১৭) এর বিপরীত গ্রহীতা। (১৯) এটা সামলানোই ভাল। (২০) মাস্টারমশাই-এর কাছে প্রচুর খেয়েছি। (২২) প্রৌঢ় বয়সে গৃহত্যাগ করে বনে গিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় দিন কাটানো। (২৪) দোকানদার। (২৫) পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য। (২৭) লক্ষ্মণের চেয়েও এই ভাই রামকে বেশি ভালবাসতেন। (২৯) আদালত। (৩০) যা লজ্জা দেয়।

উপর-নীচ :

(২) প্রহরী, রক্ষক। (৩) ব্যাধ, কিরাত। (৪) ও সহজেই অন্য লোককে—করতে পারে। (৫) সমুদ্র। (৬) মোটা লাঠি। (৮) বড় কাটারি। (৯) বাউলের হাতে এ-বাজনা বাজে। (১০) সুখে থাকতে হলে এটি সুস্থ রাখা দরকার। (১৩) দু'পাশে গাছের শ্রেণীযুক্ত পথ। (১৫) আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী এই দস্যুদের অত্যাচার বঙ্গদেশে একসময়ে প্রচণ্ড ছিল। (১৬) গৃহ, আলয়। (১৭) মূল্য। (১৮) দরজা আটকাতে বা খুলতে যা লাগে। (২১) কাজের লোক, ভৃত্য। (২২) বৃষ্টির জলধারা। (২৩) বয়সের ভারে জীর্ণ অচল। (২৪) উপাধি, বংশসূচক নাম। (২৬) বাসের—ধরে ঝোলা বিপজ্জনক। (২৭) সাহসীর মনে যা নেই। (২৮) যা দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

দেবসেনাপতি

পুরস্কার

এই শব্দসন্ধানের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে যে তিনজনের উত্তর 'আনন্দমেলা' পত্রিকা দফতরে প্রথম এসে পৌঁছবে, তাদের খাদিমের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তর পাঠাতে হবে – ১০ মে তারিখের মধ্যে।

জেরক্স প্রতিলিপি গ্রাহ্য হবে না

Model : 138007/8/9
Size : 2 - 5/12 - 1/9 - 11
Price : Rs. 185.00/163.00/150.00

Model : 210003/004
Size : 1 - 8/9 - 13
Price : Rs. 93.00/83.00

Model : 269000/1/2/3
Size : 5 - 8/9 - 2/3 - 5/6 - 9
Price : Rs. 55.00/65.00/78.00/85.00

Khadim's®
Schooldays
SMARTNESS... পায়ে পায়ে

MRP (inclusive of all taxes) applicable in West Bengal only.

R K SWAMY/BBDO KSPL 406 2K

ধা রা বা হি ক

আগে যা ঘটেছে : অর্জুন, গোরানসাহেব এবং পুলিশ অফিসার উত্তমকুমার এসে পড়ল হুতোমপুরের জঙ্গলে। জঙ্গলে কারা ফেলে গেল দুটো মৃতদেহ, রক্তশূন্য। ওদের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের করে নিয়েছে। এর পর অর্জুন চলে এল কাবুলের বাড়িতে। কাবুলের দুটি পা নেই। কাবুলের বন্ধুরা টাকা সংগ্রহ করছে ওর চিকিৎসার জন্য। বন্ধুরা ওকে আমেরিকায় পাঠাতে চায়। কাবুলের ঘরে খুঁজে পাওয়া গেল নগদ তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। এত টাকা ওকে কে দিল? তান্ত্রিক গোরক্ষনাথ পড়েছে সমস্যায়। সে সংগ্রহ করেছে খোঁড়া শকুন আর কালো বেড়াল। এখন দরকার একটি কানা কাক। যদি পাওয়া যায়, তবে এই প্রাণীর আত্মা দিয়ে সে তৈরি করতে পারবে ড্রাকুলা। সন্দীপ ও সন্দীপের বন্ধুদের থানায় ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। মেজর, গোরানসাহেব আর গোরক্ষনাথকে নিয়ে গাড়িতে উঠল অর্জুন। গাড়ি ছুটছে হাসিমারার জঙ্গলের দিকে। মাদারিহাটে এসে অর্জুনদের চা খেতে খেতে আলাপ হয়ে গেল লোকনাথের সঙ্গে। তিনি মাইল কুড়ি দূরে ব্রিটিশ আমলের একটা বাড়ি কিনেছেন। গভীর জঙ্গলে সে বাড়ি। সেখানেই রাতে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সবাই। সেই বাড়ির পাশেই বহু প্রাচীন কয়েকটি সমাধিবেদি। লম্বায় প্রায় বারো ফুট কুচকুচে এক কালো সাপ এসে ঢুকল সমাধিবেদিতে। এদিকে গোরানসাহেবের আর তর সইছে না। তাঁর অনুমান দশ বারো মাইলের মধ্যেই আছে ড্রাকুলা। মধ্যরাতে ড্রাকুলার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সকলে। প্রথমে গোরানসাহেব, তারপরে মেজর এবং অর্জুন। শেষে গোরক্ষনাথ। তার কাঁধে ঝুলছে তিনটি খাঁচা। হঠাৎ একটা রাতের পাখি চিৎকার করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। অর্জুন দেখল এক ঝাঁক বাদুড় এই মধ্যরাতে মাথার ওপর উড়ছে। তাদের ভঙ্গি খুব হিংস্র,নীচের দিকে শোঁ শোঁ করে নেমে আসছে। অর্জুন অবাক হয়ে দেখতে পেল, স্টিভেনসনের কবরে ঢোকার গর্তটা কে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর ...

ড্রাকুলার সন্ধানে অর্জুন

সমরেশ মজুমদার

১৬

গোরানসাহেব বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার! এ-কাজটা কে করল?"

অর্জুনও অবাক হয়েছিল। বলল, "সাপের গর্তের মুখ বন্ধ করতে হলে সাহস থাকা দরকার। এখানে একমাত্র আপনি আর গোরক্ষনাথ সাপ সম্পর্কে সাহসী। কিন্তু আপনারা কেন এই কাজ করতে যাবেন? তা ছাড়া সন্ধের পরে কেউ তো বাংলোর বাইরে আসেনি।"

গোরানসাহেব রেগে গেলেন, "তুমি কি পাগল? আমি যদি নিজে এই কাজটি করি তা হলে জিজ্ঞেস করব কেন? না কি তুমি আমাকেও সন্দেহভাজনদের লিস্ট থেকে বাদ দিতে চাওনি?" প্রশ্নটা করেই দূরে কিছু লক্ষ করে ফিসফিস গলায় বললেন, "সরে এসো অর্জুন, চটপট সরে এসো।"

গোরানসাহেব তৃতীয় কবরটির দিকে দৌড়ে যেতে অর্জুন অনুসরণ করল। এবং খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করতেই সাপটাকে দেখতে পেল। কাল সন্ধেবেলায় যে সাপটাকে তারা দেখেছিল, বোধ হয় সেটাই। খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে স্টিভেনসনের কবরের দিকে। এখন আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে ওর চেহারা। কবরের পাশে এসে সাপটা থমকে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কিছু খুঁজতে লাগল। পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো গোরানসাহেবকে বলতে শুনল অর্জুন, " ঢোকার গর্তটা খুঁজছে।"

হঠাৎ ফোঁস-ফোঁস শব্দ প্রবল হল। সাপটা যে খুব রেগে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। আচমকা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এত লম্বা, মোটা সাপকে কখনও ফণা তুলতে দেখেনি অর্জুন। মুখ ফাঁক হওয়ায় সরু জিভ মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওর মাথা অর্জুনের উচ্চতার সমান হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় ও যদি কাউকে আক্রমণ করে তা হলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হবে।

হঠাৎ অর্জুন লক্ষ করল গোরানসাহেবের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। সাপ দেখলে ওঁর চোখমুখ যেরকম ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, এখন সেই অবস্থা। অর্জুন শক্ত হাতে ওঁর হাত ধরল। সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করলেন গোরানসাহেব, "আমাকে যেতে দাও। ওকে আমার চাই। আমার সংগ্রহে ওর মাথাটাকে রাখব।"

"না।" চাপা গলায় বলল অর্জুন, "আপনি ওকে মারতে পারবেন না।"

হঠাৎ সাপটা নিচু হতে লাগল। এবং প্রবল শক্তিতে ওর মুখ দিয়ে নরম মাটির ওপর আঘাত করল। এক-দুই-তিনবার। তারপরেই ওর শরীরটা তরতর করে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল। তাই দেখে গোরানসাহেব দৌড়লেন, কিন্তু তিনি গর্তটার কাছে পৌঁছনোর আগেই সাপের শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতাশ হয়েও দমলেন না গোরানসাহেব, "অতবড় শরীরটা এত দ্রুত ভেতরে ঢুকল কী করে? না অর্জুন, এই কবর খুঁড়তে হবে।"

"সেটা কি ঠিক হবে?"

"মানে?"

"ওখানে আর্নল্ড স্টিভেনসনের শরীরকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। কবরটি খুঁড়লে তাঁকে অসম্মান জানানো হবে না?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এত বছরে তাঁর শরীরটা নিশ্চয়ই মাটিতে মিশে গেছে। তা ছাড়া ওই সাপটা যদি তাঁর শরীরকে আস্তানা করে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর আত্মা শান্তি পাচ্ছে না।"

তখন কড়া রোদ। অথচ বেলা এগারোটা বাজে। গোরানসাহেব সবাইকে সতর্ক করে দিলেন সাপটার শক্তি সম্পর্কে। গোরক্ষনাথ তার তিনটে প্রাণীকে নিয়ে এল কবরের কাছে। বেচারারা ঘুমোচ্ছিল, ওখানে নিয়ে আসতেই প্রবল প্রতিবাদ শুরু করে দিল। কাক চেঁচাচ্ছে, শকুন পাখা ঝাপটে চলেছে, বেড়ালটা পিঠ উঁচু করে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস আওয়াজ তুলছে। গোরক্ষনাথ চটপট বলে উঠল, "এই জায়গাট মোটেই ভাল নয় বাবু।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"এখানে তেনাদের কেউ নিশ্চয়ই আছেন। নইলে এরা এমন কাণ্ড করবে না।"

মেজর হাসলেন, "তুমি অর্ধেক সাকসেসফুল গোরক্ষনাথ। এখানে প্রেতাত্মা আছে কি না তা জানি না, তবে কবরে এককালে মৃত মানুষকে শোয়ানো হয়েছিল, এটা অন্তত তোমার প্রাণীরা জানিয়ে দিতে পেরেছে।"

গোরক্ষনাথ কবরের কাছে খাঁচা নিয়ে গিয়ে শকুনটার দরজা খুলে দিল।

সন্ধের সময় দেখা গেল আকাশে মেঘ জমেছে আর জঙ্গলের গাছপাতা আচমকা ি

দেখা গেল খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাখিটা বেরিয়ে এসে সাপের গর্তের মুখটায় চলে গেল। তারপর প্রবলবেগে গর্তের মুখ নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। গোরক্ষনাথ ওর পায়ে বাঁধা দড়ি টেনে কোনওমতে ফিরিয়ে আনতে পারল খাঁচায়। তারপর ওদের তিনজনকে রেখে দিয়ে এল দূরে। এবং সেখানে রাখার পর প্রাণী তিনটে একটু-একটু করে শান্ত হয়ে গেল।

মেজর এবং গোরানসাহেব যেসব মালপত্র এনেছিলেন তার ভেতর থেকে একটি শক্ত জাল বের করে আনা হয়েছে। মাটি খোঁড়ার জন্য বেলচা জাতীয় তিনটি স্টিলের যন্ত্র, লম্বা লাঠি আর এক বোতল অ্যাসিড। মেজর চাইছিলেন গর্তের ভেতরে বোতলটা উপুড় করে দিতে। তা হলে সাপটার আর বেঁচে থাকার কোনও সুযোগ থাকবে না। কিন্তু গোরানসাহেবের তাতে প্রবল আপত্তি। তিনি সাপটার মাথা আস্ত চান। অ্যাসিডে পুড়ে গেলে তাঁর কোনও কাজে লাগবে না।

অতএব গর্ত খুঁড়তে হবে এবং তার ফলে সাপটা নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। আর ওর রেগে যাওয়ায় যে চেহারা অর্জুন দেখেছে তাতে স্পষ্ট, ওর মোকাবিলা করা বেশ শক্ত হবে। গোরানসাহেব বললেন তিনি তৈরি থাকবেন। সাপটা ফণা তোলামাত্র তিনি তাকে জালবন্দি করবেন।

এই সময় পটা বলল, "বাবু,একটা কথা বলব?"

অর্জুন তাকাল, "শুনেছি শনি-মঙ্গলবার বাস্তুসাপ মারতে নেই। ওটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, আর একটা রাত অপেক্ষা করলে হত না?"

মেজর বললেন, "যদিও ব্যাপারটা কুসংস্কার তবু আমার প্রস্তাবটা খারাপ লাগছে না। ছেলেবেলায় আমার মায়ের মুখে এমন কথা শুনেছি।"

গোরানসাহেবকে ইংরেজিতে ব্যাপারটা বললেন মেজর।

গোরানসাহেব কাঁধ ঝাঁকালেন, "দু'হাজার সালে এসব কথার কোনও মানে আছে?"

মেজর বললেন, "নেই। তবে লোকাল মানুষের সেন্টিমেন্ট।"

অর্জুনের দিকে তাকালেন গোরানসাহেব, "তুমি কী বলো?"

অর্জুনের চোখের সামনে রাগী সাপটার ফণা তোলা শরীর ভেসে উঠল। ভয়ঙ্কর অথচ কী সুন্দর! আর একটা দিনরাতের সুযোগে ও যদি এখান থেকে পালিয়ে যায় তা হলে তো সমস্যার সমাধান হয়। এই যে ওরা এখানে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছে, সাপটা নিশ্চয়ই নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে। আর সে-কারণেই ও ওর এই আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে। অর্জুন হেসে বলল, "আজ আর কালের মধ্যে তো কোনও পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"বেশ। তবে তাই হোক।" গোরানসাহেব অবশ্য খুশি না হয়েই বললেন।

দুপুরটা কেটে গেল ঘুমিয়ে। বিকেলে আবার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কথাবার্তা। গোরানসাহেব বললেন, "আমার বিশ্বাস, আর কোথাও খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই। এখানেই সে আছে। আমরা আজকের রাতটা জেগে থাকব।"

পটা ইতিমধ্যে বিষয়টা জেনে গিয়েছে। সে দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল, "বাবু, আমাকেও কি জাগতে হবে?"

তার প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি বাংলোর ভেতরে বসে লক্ষ করব, না বাইরে গিয়ে দাঁড়াব?"

"প্রথমে আমরা ভেতরে থাকব। রাত বাড়লে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।" গোরানসাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি তখন থেকে লক্ষ করে যাচ্ছি, কিন্তু গতকাল যে সাপটাকে ওখান দিয়ে কবরের দিকে যেতে দেখেছি তাকে এখনও চোখে পড়ছে না। এর মানে ওটা ওর রুটিন নয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আজ যাকে দেখেছি সে কি গতকালেরটা নয়?"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অর্জুন।" গোরানসাহেব বললেন।

সন্ধের সময় দেখা গেল আকাশে মেঘ জমছে আর জঙ্গলের গাছপাতা আচমকা স্থির হয়ে গেছে। একটা পাতাও নড়ছে না। মেজর বললেন, "সর্বনাশ!"

অর্জুন তাকাতে মেজর হিপ পকেট থেকে ছোট চ্যাপটা বস্তুটি বের করে ছিপি খুলে তরল পদার্থ গলায় ঢেলে বললেন, "নাইনটিন এইট্টি ওয়ান। প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। ফিজিতে গিয়েছিলাম লাল ঝিনুক দেখতে। আহা, সমুদ্রের নীচে যখন ওরা পাশাপাশি থাকে তখন চোখ জুড়িয়ে যায়! তা একদিন জঙ্গলে ছিলাম। দুপুরবেলা। আচমকা সূর্যের আলো নিভিয়ে দিল বিশাল বিশাল মেঘ। অমনই গাছের পাতাগুলো ওইরকম স্থির হয়ে গেল। তারপরেই টের পেলাম পায়ের তলায় যেন হইচই শুরু হয়ে গেছে। অথচ আমার জুতোর তলায় শুধু মাটি। একটু এগিয়ে দেখলাম তিনটে গর্ত দিয়ে পিলপিল করে বড়-বড় পিঁপড়ে পাগলের মতো বেরিয়ে আসছে। মাটির নীচে ওদের ছুটে চলার কম্পন আমার জুতো ভেদ করে পায়ে পৌঁছেছিল। আমার সঙ্গী বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। এখনই বৃষ্টি নামবে।' আমরা টেন্টে পৌঁছবার এক মিনিট পরে যে বৃষ্টিটা নামল তা থেমেছিল সাতদিন পরে। সমুদ্রের জল বেড়ে গিয়েছিল সেই বৃষ্টিতে।"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে নিল। তার মুখে হাসি দেখলে মেজর খুশি হবেন না।

বৃষ্টি নামল! তুমুল বৃষ্টি। অথচ সারাদিন মেঘ ছিল না। বৃষ্টি পড়ছে অথচ হাওয়া বইছে না। জেনারেটার চালিয়ে দিয়েছিল পটা। হঠাৎ সেটা শব্দ করে থেমে যেতেই পুরো বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল।

মেজর গলা তুলে বললেন, "সবাই এক ঘরে এসে বসো। মোমবাতি কেউ একজন জ্বেলে দাও।"

দেওয়া হল। কেমন একটা গা থমথমে আবহাওয়া হয়ে গেল। গোরানসাহেবকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এভাবে বৃষ্টি শুরু হলে কি অনেকক্ষণ ধরে চলে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। এখন বর্ষাকাল নয়। তখন পাঁচ-সাতদিনেও বৃষ্টি বন্ধ হয় না।" সে বলল, "এটা বেশিক্ষণ চলবে বলে মনে হয় না।"

পটা তাগাদা দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিলে ও নিষ্কৃতি পাবে। অতএব সবাই খেয়ে নিল। টিনের খাবার বাদ দিয়ে এখন পটার তৈরি খাবারেই সবাই খুশি। খাওয়া শেষ হলে গোরানসাহেবের ঘরে গেল অর্জুন আর মেজর। এখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বৃষ্টির সঙ্গে। তার আলোয় কাচের জানলার বাইরে পৃথিবীটাকে দেখা যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট। এই ঘরটা থেকে বাড়ির পেছনের দিকটা দেখা যায়। বিদ্যুতের আলোয় কবর তিনটে যেন জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছিল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

(ক্রমশ)

গেছে। একটা পাতাও নড়ছে না। মেজর বললেন, "সর্বনাশ!"...

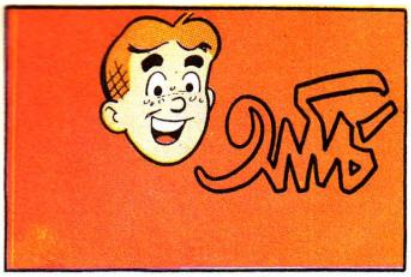
আদি

মিঃ লজ, শুভ নববর্ষ।

গত নববর্ষে কী যেন একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিল!

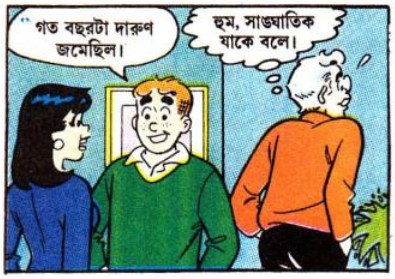
গত বছরটা দারুণ জমেছিল।
হুম, সাঙ্ঘাতিক যাকে বলে।

পার্টিটা ...

স্কুল স্পোর্টস ...

জলে দাপাদাপি, হাজার হুল্লোড়।
LODGE

এ-বছরটায় আগেরটা ছাপিয়ে যেতে হবে।
!

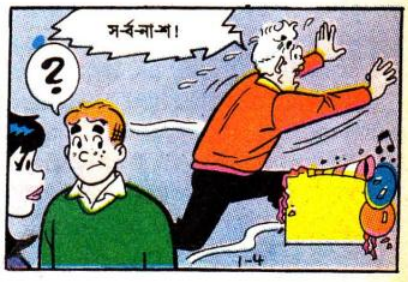
সর্ব-নাশ!
?

গাবলু

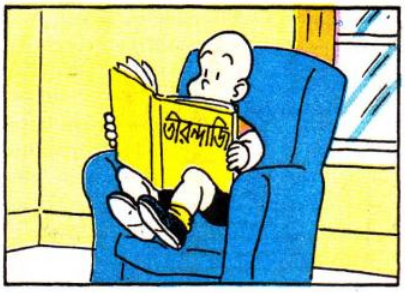
তীরন্দাজি

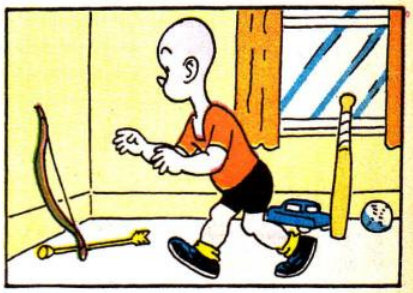

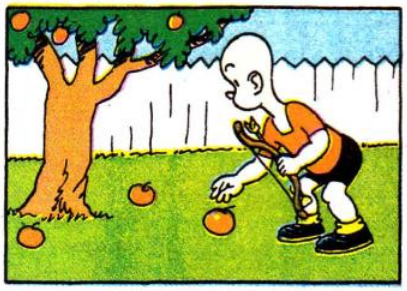

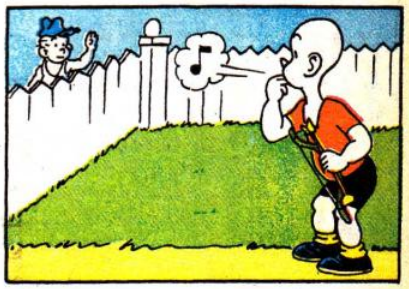

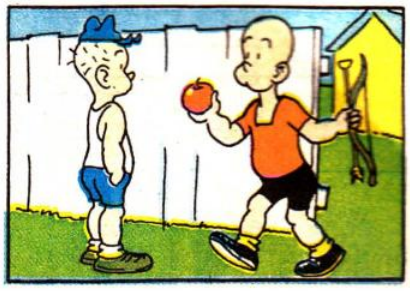

11-7

জলদি করো। এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না...

বন্ধ হোক বৃক্ষনিধন

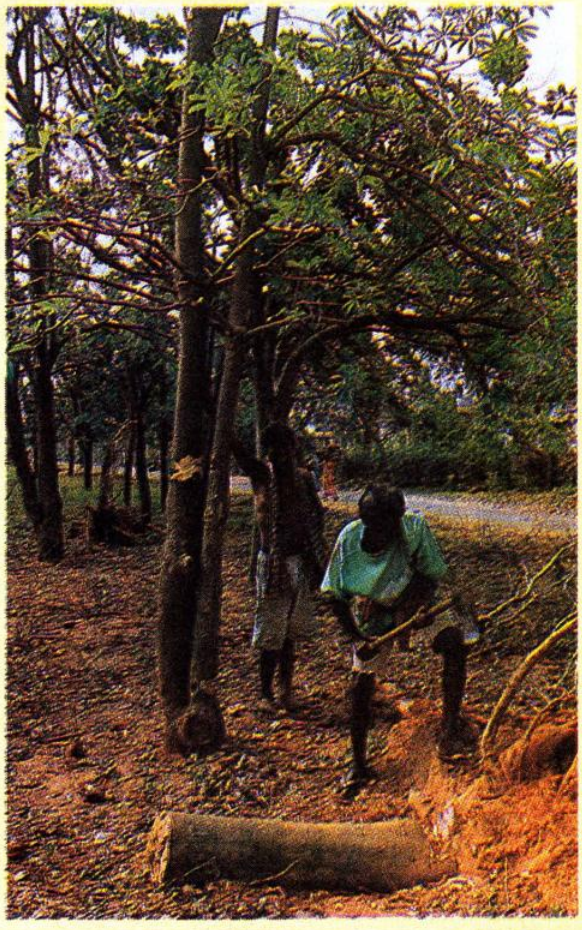

"মোড়ের মাথায় নতুন বহুতল বানাতে গিয়ে এত বছরের পুরনো গাছটা কেটে ফেলল।" —এমন আফসোসের কথা প্রায়ই শহরের এখানে ওখানে শোনা যায়। শুধু শহরই বা কেন, শহরের বাইরের ছবিও প্রায় একই রকম। গাছকাটা থামাতে চান? কী করবেন? খুব কঠিন কাজ নয়। কোনও গাছ কাটা যাবে কি যাবে না তার অনুমতি দিতে পারে শুধুমাত্র রাজ্য বনদফতর ও এলাকার পুরসভা। ক্ষেত্রবিশেষে পুরসভাকেও জানাতে হয় বনদফতরে। তাই গাছকাটা বন্ধ করতে হলে অবিলম্বে জানান এলাকার পুরসভায় বা বাইপাসের ধারে সল্টলেক স্টেডিয়ামের উলটো দিকের অরণ্যভবনে। অবশ্য স্থানীয় পুলিশকে জানালেও হয়তো কাজ হতে পারে। তারা যে বা যারা গাছ কাটতে চাইছে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র আছে কি না, তা দেখতে চাইতে পারে।

এবারের বর্ষা

গত বছর মাত্র ১০ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিতে বানভাসি হয়ে গিয়েছিল শহর কলকাতা। এবারের বর্ষা আসতে কত দেরি, কী হতে পারে এ বছর? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতেই কলকাতা পুরসভা সম্প্রতি পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশন অবস্থা নিয়ে একটি একদিনের আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিল মৌলালি যুবকেন্দ্রে। এই সেমিনারে বিভাগীয় মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, সেচমন্ত্রী গণেশ মণ্ডল তো ছিলেনই, ছিলেন কলকাতা পুরসভার বিশেষজ্ঞরাও। আরও ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার কয়েকজন প্রযুক্তিবিদ। সারাদিন নানা আলোচনা বিতর্ক তো হলই, শোনা গেল কিছু আশার কথাও। যেমন, জল নিষ্কাশনের দায়িত্বে থাকা মেয়র পারিষদ চঞ্চল ঘোষ জানালেন, হাডকোর ঋণের টাকায় খালকাটা শুরু হয়েছে, ফলে জমা জল সরার সুবিধে হবে। এশিয়ান ডিভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় ১ থেকে ৬ ও ১০১ থেকে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হবে নতুন জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ক্লিন্টন ও পরিবেশ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন আবার বিতর্কে। সেই বিতর্কের কেন্দ্রে আছে পরিবেশ। শোনা গেছে, ক্লিন্টন তাঁর পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হোয়াইট হাউসকে আগের তুলনায় অনেক বেশি 'ইকোফ্রেন্ডলি' করে তুলেছেন। আমেরিকার এবিসি টেলিভিশন সংস্থার পক্ষ থেকে ক্লিন্টনকে এ বিষয়ে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলেন টাইটানিকখ্যাত বিখ্যাত অভিনেতা লিওনার্দো ডি কাপ্রিও। বিতর্কটা দানা বেঁধেছে ওই ইন্টারভিউকে ঘিরেই।

আদিম বানর

'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইচই ফেলে দিয়েছে বিজ্ঞানীমহলে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল গেবো আর তাঁর সহকর্মী প্রত্নতাত্ত্বিকরা কয়েকবছর আগে চিনে খুঁজে পেয়েছিলেন ফসিল হয়ে যাওয়া ছোট্ট কয়েকটা পায়ের হাড়। মাইক্রোস্কোপের তলায় এতদিন গবেষণা করার পর বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ যে, এই হাড়গুলি সম্ভবত পৃথিবীর আদিমতম বানরের, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'ইওসিমিয়াস'। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রায় সাড়ে চার কোটি বছর আগে গাছের ওপর বসবাস করা এই বানরগুলির ওজন ছিল মাত্র কিছু গ্রাম এবং সেগুলি এতই ছোট ছিল যে, হাতের তালুর মধ্যেই তারা সেঁটে যেতে পারে। বিবর্তন বিশেষজ্ঞদের মতে এই আবিষ্কার বিবর্তন-বিজ্ঞানে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে।

জয়ন্ত বসু

কুইজ

গত সংখ্যার উত্তর

১. ওয়েবসাইটে। দিল্লির তুঘলক রোড থানার সংগ্রহশালা থেকে প্রাপ্ত এই ঐতিহাসিক দলিল দেখা ও পড়ার সুযোগ মিলবে WWW, KIRAN BEDI. COM ওয়েবসাইটে। মূল রিপোর্টটাই ফারসিতে লেখা। লেখক নন্দলাল মেহতা।

২. শ্রীধর ভাস্কর ভারনেকর।

৩. জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট এদুয়ার্দো শেভার্দনাদ্‌জে।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে ওইদিন এক থিয়েটারে গুলি করে জন উইলকিস বুথ নামে এক আততায়ী। ১৮৬৫ সালে। পরদিন মারা যান লিঙ্কন। এজন্যই দিনটি শোকের দিন আমেরিকায়।

৫. ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা। সিংহলিরা বঙ্গদেশের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক একাত্মতা অনুভব করেন এটি তার অন্যতম কারণ।

৬. ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন তামিলনাড়ুর মুরুগানন্দন। কেন হায়দরাবাদের শ্রীদ্ধনম রেড্ডি, ম্যানেজার তামিলনাড়ুর আবদুল রজ্জাক।

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারশে, পেনসিলভানিয়া, লুইসভিল, কেনটাকি ও ফক্সবোরো।
মহিলাদের বিশ্ব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রানার্স আপ চিন এই প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হবে

৮. পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার। সদ্য অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষায় এবার এটি ব্যবহারের অনুমতি পেল পরীক্ষার্থীরা।

৯. জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের হিমালয়ে সিয়াচেন বেস ক্যাম্পে।

১০. ১৪ বছর বয়সের গোবিন্দ জাজু। সে রাজস্থানের জয়পুরের বাসিন্দা।

১১. মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী মন্দিরের ভেতর অসমাপ্ত একটি মিনারের স্তম্ভে আঘাত করলেই বেজে ওঠে এই সুরেলা আওয়াজ।

১২. ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস।

১৩. অক্টোবরের প্রথম দিনটি।

১৪. রাশিয়ান টি।

প্রশ্ন

১. তিনি রাজা হয়েছিলেন মাত্র ১৭ মাস বয়সে। ফ্রান্সকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কে ইনি?
সুজিতা ঘোষরায়, গড়িয়া, কলকাতা।

২. বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। জন্ম ১৭৭৮ সালে। সমালোচক হিসেবে সেকালে বিখ্যাত ছিলেন। কে ইনি?
অনুপম বৈদ্য, সালকিয়া, হাওড়া।

৩. ইচ্ছে ছিল হবেন চিত্রকর। কিন্তু সারা পৃথিবী তাঁকে জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির এক প্রধান নায়ক হিসেবে। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মেইন ক্যাম্ফ'। জন্ম এপ্রিলের ২০ তারিখে। কে ইনি?
মৃদুলা চৌধুরী, কল্যাণী, নদিয়া।

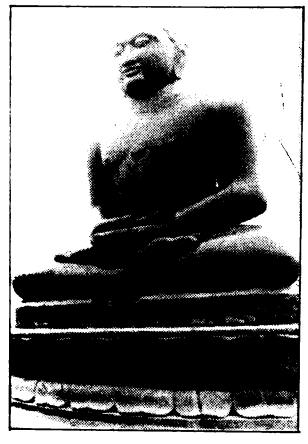

৪. সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এ-পুরস্কারকে তুলনা করা হয় নোবেলের সঙ্গে। যাঁর নামে এই পুরস্কার তিনি নিজে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সংবাদপত্র শিল্পের মালিক। তাঁর জন্ম ১৮৪৭ সালে। কে ইনি?
মহম্মদ ইসমাইল, শ্রীরামপুর, হুগলি।

৫. তিনি আইনজীবী, দক্ষ কূটনীতিক এবং সৈনিকও ছিলেন বটে। কিন্তু সারা পৃথিবী তাঁকে জানে ঔপন্যাসিক হিসেবেই। তাঁর বিখ্যাত সেই গ্রন্থ 'বেন হার'। ১৮২৭ সালে জন্মানো এই মানুষটি কে?
জলধি মহাপাত্র, বেলদা, মেদিনীপুর।

৬. তাঁর জন্ম মিশরে ১৯৩২ সালে। নাম মিশেল শ্যালুব। কিন্তু এ-নামে নয়, বিখ্যাত এই অভিনেতাকে অন্য নামে চেনে সারা বিশ্বের দর্শক। 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' এবং 'ডক্টর জিভাগো'-য় কেন্দ্রীয় চরিত্রে তাঁর রোমান্টিক অভিনয় মুগ্ধ করেছে হাজার-হাজার দর্শককে। কে ইনি?
কৃপাসিন্ধু দেবনাথ, দত্তনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

৭. মহারাষ্ট্রের শিবাজি টার্মিনাস থেকে ডোম্বিভিলি পর্যন্ত তিনি চালিয়ে নিয়ে গেলেন লোকাল ট্রেনটি। এবং এই সঙ্গেই ভারতীয় রেলে রচিত হল এক নতুন অধ্যায়। কারণ ইনিই অর্জন করলেন ভারতের প্রথম মহিলা লোকোমোটিভ চালক হওয়ার সম্মান। কে ইনি?
অনিরুদ্ধ নাওলেকর, বরানগর, কলকাতা।

৮. এক সময় বিখ্যাত ওই থ্রিলার চলচ্চিত্রের নায়ক বলতে তাঁকেই বোঝাত। বহু অপরাধীকে টিট করেছেন তিনি গোয়েন্দা হিসেবে। দীর্ঘ ১৫ বছর পরে আবার চলচ্চিত্রে ফিরছেন তিনি। এবার গুপ্তচরের ভূমিকায়, জীবাণুযুদ্ধ নিয়ে রচিত কাহিনীতে। কে ইনি? এবার কোন চলচ্চিত্রে?
দীপান্বিতা মজুমদার, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা।

৯. গুপ্তঘাতক যে-কোনও মুহূর্তে বিশ্বের যে-কোনও প্রান্তে কেড়ে নিতে পারে তাঁর জীবন। দীর্ঘদিন গোপন আস্তানায় প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে বাস করতে হয়েছে তাঁকে।

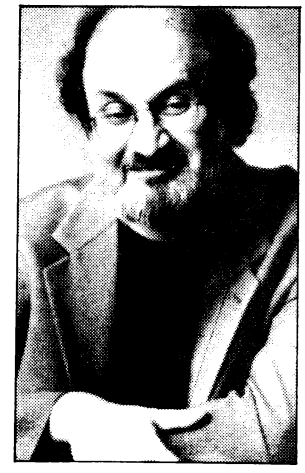

ভারতে অর্থাৎ স্বদেশে আসেননি ১২ বছর। হঠাৎই এপ্রিলের মাঝামাঝি সপুত্র ভারতে হাজির। কে ইনি? ভারতে হঠাৎ আসা কেন? কেনই বা সদাই তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা?
এমদাদ আলি, আরামবাগ, হুগলি।

১০. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উপজাতি তথা আদিবাসী উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে অনলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। এই সেবামূলক কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেলেন পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের 'মহাবীর' পুরস্কার। এই অর্থও তিনি ব্যয় করবেন উপজাতি মহিলাদের কল্যাণমূলক কাজে। কে ইনি?
মন্দিরা বর্মণ, আগরতলা, ত্রিপুরা।

১১. তাঁর জন্ম যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে। এ-বছর তাঁর ২৬০০তম জন্মজয়ন্তী। ইতিহাসবিদদের অনুমান, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাঁর। সব ধর্মের মানুষের কাছেই শ্রদ্ধেয় এই মহাপুরুষ। কে ইনি?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

প্রশ্ন

১. এই প্রথম কোনও বাঙালি পেলেন এই পুরস্কার। প্রাপক বছর বত্রিশের বাঙালি। জন্ম লন্ডনে। বড় হয়ে উঠেছেন রোড আইল্যান্ডে। বাবা-মা থাকেন বস্টনে। তিনি নিজে নিউ ইয়র্কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্নার্ড কলেজের স্নাতক। বস্টনে তাঁর থিসিস আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে। এই লেখিকার ছ'টি গল্পের অনুবাদও তিনি করেছেন। মাঝেমধ্যেই কলকাতায় আসেন বেড়াতে। কে এই পুরস্কারপ্রাপক?

২. ওড়িশায় গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে কুষ্ঠরোগীদের সেবাই তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। পুরীতে তিনি গড়ে তুলেছেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল, একটি কুষ্ঠ সেবাশ্রম, এই রোগীদের সন্তানদের জন্য একটি বিদ্যালয়ও। তাঁর এই মানবসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ গত ১১ এপ্রিল পুরীতে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশিষ্ট এক পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। কোন পুরস্কার? কে ইনি?

ফোটো : এ পি/পি টি আই

৩. হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীনই এই পুরস্কার তাঁকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ৩০ চৈত্র যখন এই পুরস্কার দেওয়া হল তখন তিনি আর ইহজগতে নেই। মরণোত্তর এই পুরস্কার কাকে দেওয়া হল? কোন পুরস্কার?

৪. এই কিছুদিন আগেও কলকাতা বইমেলায় ঘুরে গেছেন তিনি। মৌলবাদীদের হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে। বিতর্কিত কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। সমালোচনার ঝড় উঠেছে তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ নিয়েও। সেই গ্রন্থের জন্যই অতি সম্প্রতি কলকাতার একটি পত্রিকা গোষ্ঠীর বিশিষ্ট পুরস্কার পেলেন তিনি। কে এই সাহিত্যিক? কোন পুরস্কার? প্রথম কোন পুরস্কার তাঁকে খ্যাতির আলোয় আনে?

ফোটো : অলক মিত্র

৫. চিত্রতারকাদের মধ্যে প্রথম পদ্মভূষণ সম্মান পান কে?

৬. বি আর অম্বেডকর, নেলসন ম্যান্ডেলা, রাজীব গাঁধী, সর্দার বল্লভভাই পটেল, মোরারজি দেশাই, মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ, সত্যজিৎ রায়, গুলজারিলাল নন্দ, অরুণা আসফ আলি, ডঃ এ পি জে আবদুল কালাম, এম এস শুভলক্ষ্মী, সি সুব্রহ্মণ্যম—কোন সূত্রে এই নামগুলি একসঙ্গে উল্লিখিত?

৭. বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার কে পান? কোন গ্রন্থের জন্য?

৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিতকালে কোনও পুরস্কার পাননি তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। মৃত্যুর পর তাঁকে দেওয়া হয় মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার। তাঁর কোন উপন্যাসের জন্য?

৯. বাংলা থেকে সাহিত্যকর্মের জন্য দু'জন লেখিকা পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। এঁরা কে কে?

১০. সন্তোষকুমার ঘোষ অকাদেমি পুরস্কার পান কোন গ্রন্থের জন্য?

১১. পার্ল বাক নোবেল পুরস্কার পান কোন গ্রন্থের জন্য?

১২. শুধু লেখিকা হিসেবেই নয়, অন্ত্যজ শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের উন্নয়নেও অসামান্য ভূমিকা তাঁর। এদের কথাই বারবার আসে তাঁর রচনায়। সরকারি সম্মান পেলেও প্রয়োজনে সরকারের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনায় আজও সমান তীক্ষ্ণ তাঁর লেখনী। এই মহীয়সীকে সম্প্রতি কলকাতায় রাজভবনে এসে সাম্মানিক ডি লিট উপাধি প্রদান করে গেলেন ভারতেই অন্য একটি রাজ্যের রাজ্যপাল। কারা এই সম্মান জানালেন? কাকে?

১৩. রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন গত ১৪ এপ্রিল প্রদান করলেন ডঃ অম্বেডকর পুরস্কার। কীজন্য দেওয়া হয় ওই পুরস্কার? ওইদিনে কেন? কারা পেলেন?

উত্তর

১. বাঙালি মেয়ে ঝুম্পা লাহিড়ি। তিনি আর্টস ক্যাটিগরিতে পেলেন পুলিৎজার পুরস্কার। এই পুরস্কার তিনি পেলেন 'ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ' গল্পগ্রন্থের জন্য। ন'টি গল্পের এই সঙ্কলনের মধ্যে তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায়। ২. পোল্যান্ডের জাতীয় পুরস্কার 'শিভালরি ক্রস অব অর্ডার অব রিবার্থ অব পোল্যান্ড'। ভারতে পোলিশ রাষ্ট্রদূত ক্রিজতফ স্রোজিইস্ক এই পুরস্কার তুলে দিলেন অশীতিপর মিশনারি রেভারেন্ড ফাদার ম্যারিয়ান জেলাজেকের হাতে। পোল্যান্ডে পোজনানে ১৯১৮ সালে জন্ম এই সেবাব্রতীর। ৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দিন পুরস্কার। মরণোত্তর এই পুরস্কার পেলেন সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪. তসলিমা নাসরিন। 'আমার মেয়েবেলা' গ্রন্থের জন্য এ-বছরের আনন্দ পুরস্কার পেলেন তিনি। এর আগে ১৯৯২ সালে প্রথমবার তিনি আনন্দ পুরস্কার পান 'নির্বাচিত কলম' গ্রন্থের জন্য। ৫. মুম্বইয়ের বিশিষ্ট অভিনেত্রী নার্গিস। সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। ৬. এঁরা প্রত্যেকেই পেয়েছেন 'ভারতরত্ন' উপাধি।

৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আরোগ্য নিকেতন'। ৮. 'ইছামতী'। ৯. আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবী। ১০. 'শেষ নমস্কার'। ১১. 'গুড আর্থ'। ১২. সম্প্রতি কলকাতার রাজভবনে এসে মহাশ্বেতা দেবীকে সাম্মানিক ডি লিট প্রদান করে গেলেন হিমাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল। তাঁকে এই সম্মান প্রদান করল কানপুরের ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩. সমাজে অনগ্রসর ও দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন ও সেবাকার্যের স্বীকৃতির জন্যই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। অম্বেডকরের জন্মজয়ন্তীতে। পুরস্কারপ্রাপক মধ্যপ্রদেশের নারায়ণপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং কস্তুরবা গাঁধী কন্যা গুরুকুল।

ANANDAMELA 3 MAY 2000 REGD NO. WB/…
…-SOUTH/683/97 TN/MS(C) 731. RS. 10…

INSTA-WHITENING SYSTEM™

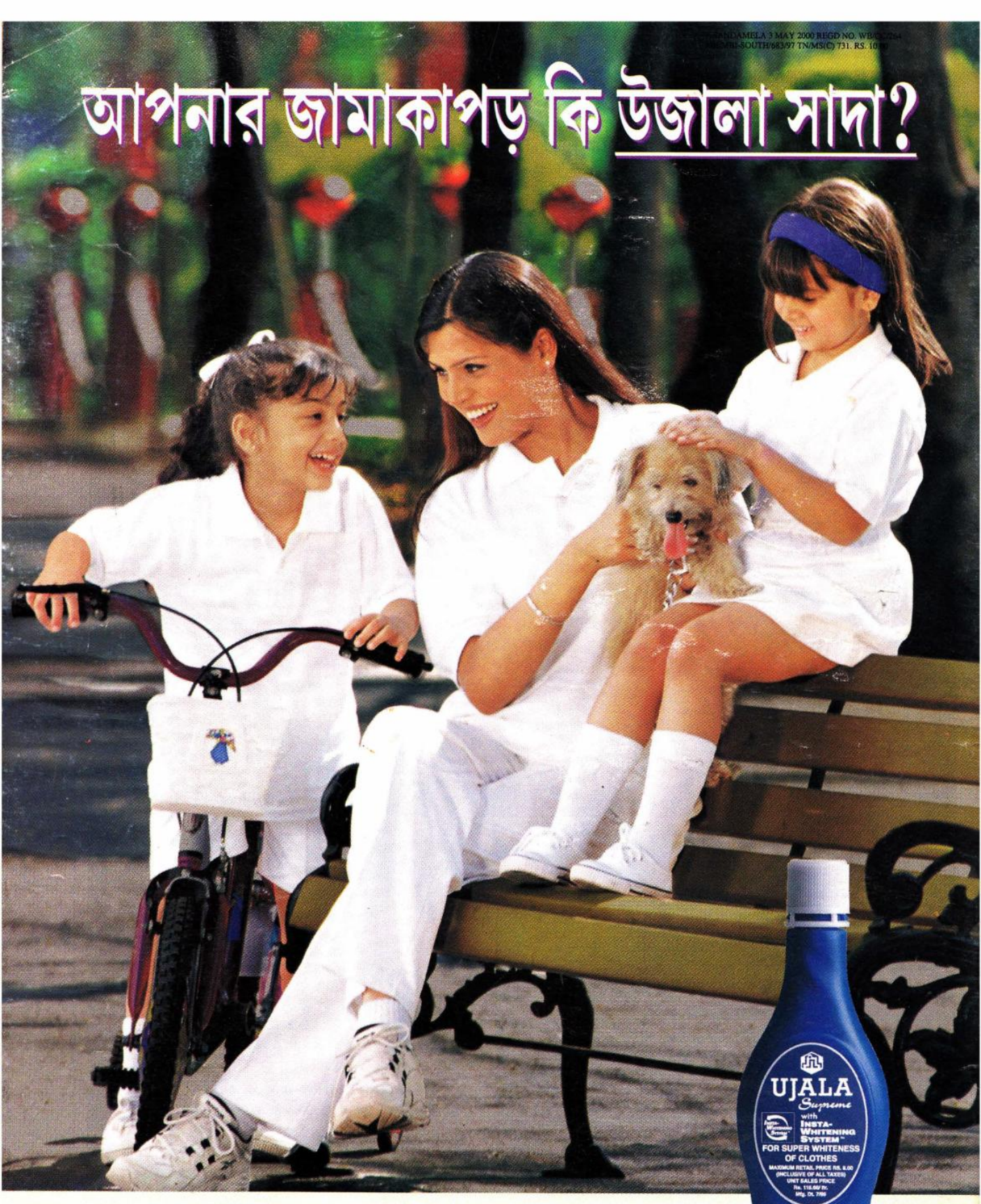

একমাত্র উজালা সুপ্রীমে আছে অভিনব **ইনস্টা হোয়াইটেনিং সিস্টেম**™(IWS), যা আপনার জামাকাপড়ে এনে দেয়,এক চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতা। এবং উজালার এমনই শক্তি যে লিটার জলে মাত্র চার ফোঁটাই যথেষ্ট। তাই কেবল উজালাই দিতে পারে এক নতুন সাদা - উজালা সাদা।

শুভ্রতার নতুন রং

A product of Jyothy Laboratories Ltd. উজালা সুপ্রীম এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।

Situations/JL/12/2000 Ben